মায়াকানন

মায়াকানন

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

১৩৩৬

প্রকাশক
শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
ডি, এম, লাইব্রেরী
৬১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

মূল্য পাঁচসিকা মাত্র

প্রবাসী প্রেস
৯১, আপার সার্কুলার রোড,
কলিকাতা
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত।

কন্যা

শ্রীমতী পুষ্পমালার করকমলে

বাবার

আদরের উপহার

পূর্ব্ব-কথা

বিনয়বাবুর ডায়ারিতে যে অতি-আশ্চর্য্য ঘটনাটি আছে, তা পড়বার আগে একটুখানি পূর্ব্ব-ইতিহাস জানা দরকার।

য়ুরোপ-আমেরিকার পণ্ডিতেরা যে আজকাল 'মার্স' বা মঙ্গলগ্রহে যাবার চেষ্টা করছেন, এ খবর এখন বোধ হয় পৃথিবীর কারুর কাছেই অজানা নেই।

পণ্ডিতদের মতে, মঙ্গল গ্রহে একরকম জীবের বসতি আছে, তাদের চেহারা মানুষের মতন না হ'লেও মানুষের চেয়ে তারা কম-বুদ্ধিমান নয়। অনেকের মতে তাদের বুদ্ধি মানুষেরও চেয়ে বেশী। কিন্তু পণ্ডিতদের কথা এখন থাক্।

... ...মঙ্গল গ্রহ থেকে আশ্চর্য্য এক উড়ো-জাহাজে চ'ড়ে একদল বেয়াড়া আকারের বামন জীব একবার পৃথিবীতে বেড়াতে এসেছিল।

যাবার সময়ে অদ্ভুত উপায়ে তারা অনেক মানুষকে মঙ্গলগ্রহে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল।

বন্দীদের ভিতরে ছিল বিমল, কুমার ও রামহরি—যাঁরা "যকের ধন" উপন্যাস পড়েছেন তাঁদের কাছে এরা অপরিচিত নয়। বিনয়বাবু ও কমলও বন্দী হয়েছিল—এবং সঙ্গে ছিল কুমারের বড় আদরের বাঘা কুকুর।

বিনয়বাবু বয়সে প্রৌঢ়,—নানা বিষয়ে জ্ঞান তাঁর অগাধ। অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য তাঁর নখদর্পনে। দলের সকলেই তাঁকে মান্ত ও শ্রদ্ধা করত।

বিমল, কুমার ও কমল বয়সে যুবক। বিমলের সাহস ও বাহুবল অসাধারণ।

রামহরি হচ্ছে বিমলের পুরানো চাকর।

অন্যান্য বন্দীদের পরিচয় আপাততঃ অনাবশ্যক।

মঙ্গলগ্রহে যে-সব রোমহর্ষক ও আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটেছিল, বিনয়বাবুর ডায়ারিতে তা লেখা আছে। ডায়ারির সেই কাহিনী "মেঘদূতের মর্ত্তে আগমন" নামে ১৩৩২—১৩৩৩ সালের "মৌচাকে" ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে গেছে।

"মায়াকানন" বা "ময়নামতীর মায়াকানন"ও ১৩৩৩—১৩৩৪ সালের "মৌচাকে" প্রকাশিত হয়েছিল।

যদিও এটি সম্পূর্ণ নূতন এক উপন্যাস, তবু এর আরম্ভ হয়েছে "মেঘদূতের মর্ত্তে আগমনে"র শেষ পরিচ্ছেদের শেষ অংশ থেকে।

বুদ্ধি ও শক্তিতে পরাস্ত হয়ে মঙ্গলগ্রহের বামনরা শেষটা বন্দী মানুষদের হাতেই বন্দী অবস্থায়, উড়ো-জাহাজ নিয়ে পৃথিবীতে আসতে বাধ্য হয়েছিল।

বিনয়বাবুর ডায়ারির সেই স্থানটি আমি এখানে উদ্ধার ক'রে দিলুম।:—

"ঐ ফুটে উঠছে ভোরের আলো,—পূর্ব্ব-আকাশের তলায় আশার একটি সাদা রেখার মত। আকাশের বুকে তখনো রাতের কালো ছায়া ঘুমিয়ে আছে এবং সাম্‌নের দৃশ্য তখনো অন্ধকারের আস্তরণে ঢাকা। তবে, অন্ধকার এখন অনেকটা পাতলা হয়ে এসেছে বটে!

মুখ বাড়িয়ে দেখলুম, পৃথিবীর সমস্তই আবছায়ার মতন,—এখনো গাছপালার সবুজ রং চোখের উপরে ভেসে ওঠে-নি!

বিমল, কুমার, কমল ও রামহরি আর থাকতে পারলে না, তারা তখনি উড়োজাহাজ ছেড়ে নেমে পড়ল। আমিও নীচে নামলুম—বাঘাও আমাদের সঙ্গ ছাড়লে না।

আঃ, কি আরাম! এতকাল পরে পৃথিবীর প্রথম স্পর্শ, সে যে কি মিষ্টি! মাটিতে পা দিয়েই টের পেলুম, আমরা স্বদেশে ফিরে এসেছি!

কমল তড়াক ক'রে এক লাফ মেরে বললে, "হ্যাঁ, এ

আমাদের পৃথিবীই বটে! এক লাফে আমি আর তিন তলার সমান উঁচু হ'তে পারলুম না তো!"

খানিক তফাতে হঠাৎ কি-একটা শব্দ হ'ল—ছুড়ুম্, ছুড়ুম্, ছুড়ুম্! যেন ভীষণ ভারি পায়ের শব্দ!

আমরা সচমকে সাম্‌নের দিকে তাকালুম! অন্ধকারের আবরণ তখনো স'রে যায়-নি, তবে একটু দূরে প্রকাণ্ড একটা চলন্ত পাহাড়ের কালো ছায়ার মত কি-যেন চ'লে যাচ্ছে ব'লে মনে হ'ল!

বাঘা ভয়ানক জোরে ডেকে উঠল, আমরা সবাই স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইলুম!

নিজেদের চোখকে যদি বিশ্বাস করতে হয়, তাহ'লে বলতে পারি, আমাদের সুমুখ দিয়ে যে-জীবটা চ'লে যাচ্ছে, সেটা তালগাছের চেয়ে কম-উঁচু হবে না! তার পায়ের তালে দেহের ভারে পৃথিবীর বুক ঘন ঘন কেঁপে উঠছে!... ... ...

মহাকায় জীবটা কোথায় মিলিয়ে গেল, কিন্তু তার চলার শব্দ তখনো শোনা যেতে লাগল—ছুড়ুম্, ছুড়ুম্, ছুড়ুম্!

বিমল শুষ্ক স্বরে বললে, "বিনয়বাবু!"

—"অ্যাঁ?"

—"ওটা কি?"

—"অন্ধকারে তো কিছুই দেখতে পেলুম না!"

—"কিন্তু যেটুকু দেখলুম, তাইই কি ভয়ানক নয়? এ আমরা কোথায় এলুম?"

—"পৃথিবীতে।"

—"কিন্তু এইমাত্র যাকে দেখলুম, সে কি পৃথিবীর জীব?"

আমিও অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম। ওদিকে আকাশের কোলে শুয়ে উষার চোখ ক্রমেই ফুটে উঠতে লাগল!

মায়াকানন

(বিনয়বাবুর ডায়ারি)

এক

অপূর্ব্ব পৃথিবী

ঊষার চোখ ক্রমেই ফুটে উঠছে।... ... ...কিন্তু পৃথিবী তখনো আপনার বুকের উপর থেকে আবছায়ার চাদরখানি খুলে রেখে দেয়-নি!

যেদিকে সেই মহাকায় জীবটা চ'লে গেল, সেই দিকে হতভম্বের মতন তাকিয়ে আমরা কয়জনে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছি!

আচম্বিতে আর এক পরিচিত শব্দে আমরা সকলেই চম্‌কে উঠলুম! যেন হাজার হাজার শ্লেটের উপরে কারা হাজার হাজার পেন্সিল টানছে আর টানছে!

এক লহমায় আমাদের আড়ষ্ট-ভাব ঘুচে গেল!

কুমার সর্ব্বাগ্রে চেঁচিয়ে উঠল, "বামনদের উড়োজাহাজ!"

বিমল বললে, "সে কি কথা!. উড়োজাহাজ তো বিকল হয়ে পৃথিবীতে এসে নেমেচে, মেরামত না করলে আর উড়তে পারবে না!"

রামহরি আকাশের দিকে হাত তুলে বললে, "ঐ দেখ খোকাবাবু!"

আমাদের চোখের সামনে দিয়ে বিপুল একটা কালো ছায়া ঠিক বিদ্যুতের মতন বেগে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে!—হ্যাঁ, এ মঙ্গলগ্রহের উড়োজাহাজই বটে!

কুমার বললে, "কি সর্ব্বনাশ! অনেক মানুষ যে ওর মধ্যে আছে!"

কমল তাড়াতাড়ি বললে, "কুমারবাবু, বন্দুক ছুঁড়ুন—বন্দুক ছুঁড়ুন!"

বিমল হতাশ ভাবে বললে, "আর মিছে চেষ্টা! বামনরা আমাদের চোখে ধূলো দিয়েচে, উড়োজাহাজ বন্দুকের সীমানার বাইরে চলে গেছে!"

এরি-মধ্যে উড়োজাহাজখানা আকাশের গায়ে প্রায়

মিলিয়ে যাবার মতন হ'য়েছে—না-জানি কতই বেগে সে উড়ে চলেছে।

ভোরের আলো তখন মাটির বুকেও নেমে এসেছে এবং অন্ধকার স'রে যাচ্ছে বন-জঙ্গলের ভিতর দিকে।

আমি বললুম, "বামনরা যে কি ক'রে চম্পট দিলে কিছুই তো বুঝতে পারচি না, অতগুলো লোককে আমরা তো তাদের উপরে পাহারায় রেখে এসেচি!"

বিমল বললে—"বোধ হয় বন্দুক নিয়ে আমরা চলে আসাতেই বামনদের সাহস বেড়েচে, তারা মানুষদের আক্রমণ করেচে।"

—"সম্ভব। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ নেই, চল, যেখানে উড়োজাহাজ এসে নেমেছিল, সেখানটা একবার দেখে আসি।"

জায়গাটা বেশী দূরে নয়। আমরা যেদিক থেকে এসেছিলুম আবার সেইদিকেই এগিয়ে চললুম।

তখন চারিদিক দিব্য ফরসা হয়ে এসেছে। কিন্তু চোখের সুমুখে যে সব দৃশ্য দেখছি তা একেবারে অভাবিত ও অপূর্ব্ব!

পশ্চিমদিকে পাহাড়ের উপর পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ভোরের আলোতে প্রাতঃস্নান করছে।

পাহাড়গুলোর উপরে উদ্ভিদের চিহ্নমাত্র নেই, কিন্তু তাদের তলাতেই অনাদিকালের নীল অরণ্য!

পূর্ব্বদিকে মস্ত-একটা প্রান্তর ধূ ধূ করছে—মাঝে মাঝে এক-একটা গাছের কুঞ্জ ; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, অত-বড় মাঠের কোথাও একগাছা ঘাসের নামগন্ধও নেই। মাঠের একপাশ দিয়ে একটা চিক্‌চিকে রেখা এঁকে বেঁকে কোথায় চ'লে গেছে—নিশ্চয়ই নদী।

উত্তরদিকেও বন-জঙ্গল আর গাছপালা। অধিকাংশ গাছই ছোট ছোট, এবং তাদের আকার এমন অদ্ভুত যে, পৃথিবীর কোন গাছের সঙ্গেই মেলে না!

দক্ষিণদিকে গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে, অনেক দূরে জলের উপরে সূর্য্য-কিরণের ঝিকিমিকি! জলের নীল রং দেখে আন্দাজ করলুম, সমুদ্র।

আমাদের পায়ের তলাতে যে জমি রয়েছে তা অত্যন্ত কঠিন, প্রায় পাথর বললেই চলে—সেখানেও ঘাসের চিহ্ন নেই। মাঝে মাঝে এক-একটা ঝোপের ভিতরে অজানা নানারকম আশ্চর্য্য ফুল ফুটে আছে, সে-সব ফুলের কোনটারই আকার ছোট নয়, আর তাদের সকলেরই বোঁটায় বড় বড় কাঁটা!

বিমল কৌতূহলী চোখে চারিদিকে চাইতে চাইতে

বললে, "কি আশ্চার্য্য বিনয়বাবু, এ আমরা কোন দেশে এলুম ? এমন ভোরের বেলা, অথচ একটা পাখী পর্য্যন্ত ডাকচে না !"

কুমার বললে, "এমন বন-জঙ্গল, অথচ একটা ফড়িং কি প্রজাপতি পর্য্যন্ত উড়চে না !"

বাস্তবিক, এ বড় অসম্ভব ব্যাপার। চারিদিকে কোথাও কোন্ জীবের সাড়া বা চিহ্ন নেই !

আমি বললুম, "এ যেন ময়নামতীর মায়াকানন !"

কমল বললে, "সে আবার কি ?"

—"প্রাচীনকালে বাংলা দেশে মাণিকচন্দ্র ব'লে এক রাজা ছিলেন। ময়নামতী তাঁর রাণী। প্রবাদ আছে, ময়নামতী ডাকিনী-বিদ্যা শিখে গুরুর বরে অমর হ'য়েচে। এখানে এসে আমার মনে হচ্চে, এ যেন সেই ময়নামতীর মায়াপুরী—কীটপতঙ্গ পশুপক্ষী পর্য্যন্ত ভয়ে এখানে দেখা দেয় না !"

রামহরি এতক্ষণ সকলের আগে আগে পথ চলছিল, আমার কথা শুনেই সে মুখ শুকিয়ে সকলের পিছনে এসে দাঁড়াল !

আমি হেসে বললুম, "কি হ'ল হে রামহরি, হঠাৎ পিছিয়ে পড়লে কেন ?"

—"আজ্ঞে, আপনার কথা শুনে।"

—"কেন, কি কথা ?"

—"ঐ যে বললেন এ বন হচ্চে ময়নামতীর মায়াকানন! বুড়ী ময়নার গল্প আমিও জানি বাবু! সে বনকে সহর করত, সহরকে বন করত, ভেড়াকে মানুষ আবার মানুষকে ভেড়া বানাত! যত ভূত-প্রেত আর ডাকিনী-যোগিনী আর কথায় উঠত-বস্‌ত।"

—"রামহরি, এত সহজে তুমি ভয় পাও কেন ? আমি যা বললুম তা কথার কথা মাত্র!"

—"ভয় পাই কি সাধে ? যে বিপদ থেকে সবে পার পেয়েচি, আমি আর কিছুই অসম্ভব মনে করি না! কে জানে এ আবার কোন্ মুল্লুকে এলুম—পৃথিবীর সঙ্গে এর তো কিছুই মিলচে না। যেখানে পাখা নেই, প্রজাপতি নেই, ফড়িং নেই, সে কি পৃথিবী ? এই শেষ-রাতে চোখের সামনে দিয়ে পাহাড়ের মতন কি-একটা চলে গেল, পৃথিবীতে কি সে-রকম কোন জীব থাকে ?"

আমি আর কোন জবাব দিলুম না। রামহরির ভয় হাস্যকর বটে, কিন্তু তার যুক্তি অসঙ্গত নয়।

বিমল বললে, "বিনয়বাবু, আমাদের উড়োজাহাজ

কোথায় এসে নেমেছিল, আমরা বোধ হয় তা আর ঠিক করতে পারব না।”

আমি বললুম, “আমারও তাই মনে হ’চ্চে। অন্ধকারে আমরা কোথায় নেমেছিলুম এখন তা আর বোঝা শক্ত।”

রামহরি দরদ-ভরা গলায় বললে “আহা, উড়ো-জাহাজের ভেতরে যে মানুষগুলো ছিল, তাদের দশা কি হবে ?”

কমল বললে, “যার অদৃষ্টে যা আছে। তাদের আবার মঙ্গল গ্রহে ফিরে যেতে হবে,—আর কি !”

কুমার বললে, “এখন ও-সব বাজে কথা রেখে নিজেদের কথা ভাবো। আমাদের অদৃষ্টও খুব উজ্জ্বল বলে মনে হচ্চে না। কিন্তু ও কি। বিমল, বিমল !”

আমরা সকলেই স্পষ্ট দেখলুম, অল্পদূরেই বনের এক অংশ উপর থেকে তলা পর্য্যন্ত দুলছে। তার পরেই দেখা গেল, বনের উপরে চূড়ার মতন খুব-উঁচু একটা গাছ বার দুয়েক দুলেই মড়্ মড়্ শব্দে ভেঙে প’ড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিমল বিস্মিতভাবে বললে, “অতখানি জায়গা জুড়ে বন দুলচে—কে ওখানে আছে ?”

কুমার বললে, "এখন ঝড়ও নেই, জোরে হাওয়াও বইচে না। তবে অত-বড় গাছ এত সহজে ভাঙলে কে?"

বাঘা একবার ঘেউ ঘেউ ক'রে ডেকে উঠল, তারপর ছুটে সেই বনের ভিতরে গিয়ে ঢুকল!

আমার গা কেমন শিউরে শিউরে উঠতে লাগল। আমি বিজ্ঞানকে মানি, এবং বিজ্ঞান যে অনেক অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভব করেছে তাও আমি জানি,—কিন্তু এখানে এসে যে-সব কাণ্ড দেখছি তার তো কোনই হদিস্ পাচ্ছি না! এ আমাদের চোখের ভ্রম, মনের ভ্রম,—না সত্যই কোন অলৌকিক ব্যাপার?

হঠাৎ দেখলুম বাঘা তীরের মতন বেগে বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল! তার ল্যাজ পেটের তলায় গুটানো, আর তার চোখদুটো বিষম ভয়ে যেন ঠিক্‌রে বেরিয়ে পড়তে চাইছে। সে এসেই বিমলের পায়ের তলায় মুখ গুঁজ্‌ড়ে শুয়ে পড়ল!

বিমল তার মাথা চাপ্‌ড়াতে চাপ্‌ড়াতে বললে, "বাঘা তো কখনো ভয় পায় না! সে এমন কি দেখেচে?"

আমি গম্ভীর স্বরে বললুম, "বিমল, এ জায়গা বড়

সুবিধের নয়। এস, এখান থেকে আমরা চ'লে যাই—একটা মাথা গোঁজবার ঠাঁই খুঁজতে হবে তো!"

বিমল একবার বাঘা, আর একবার বনের দিকে তাকিয়ে জড়িত স্বরে বললে, "কিন্তু বনের ভিতরে কি আছে,—বাঘা কি দেখে এত ভয় পেয়েচে?"

দুই

বোম্বাই ফড়িং

আমরা সেই ভয়াবহ অরণ্য থেকে পালাবার জন্যে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হ'তে লাগলুম।

চলতে চলতে বার বার পিছনে তাকিয়ে সেই একই দৃশ্য দেখলুম—বনের এক জায়গায় গাছপালা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ভাবে দুলছে আর দুলছে! কেন দুলছে, কে দোলাচ্ছে?

বাঘা আমাদের পায়ে পায়ে জড়িয়ে চলতে লাগল, কিন্তু ভয়ে সে তখনো জড়সড় হয়ে আছে!

বনের ভিতরে কী যে বিভীষিকা লুকিয়ে আছে এবং বাঘা যে কি দেখে ভয়ে অমন মুসড়ে পড়েছে, অনেক ভেবেও তার কোন হদিস পেলুম না!

কুমার বললে, "আমার বাঘা বাঘ দেখেও ভয় পায়

না। কিন্তু এর অবস্থাই যখন এমন কাহিল হয়ে পড়েচে, তখন এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, বনের ভেতরে নিশ্চয়ই কোন ভয়ঙ্কর কাণ্ড আছে।"

বিমল দাঁড়িয়ে প'ড়ে বললে, "চুপিচুপি ওখানে গিয়ে আমি একবার দেখে আস্‌ব কি ?"

আমি তাড়াতাড়ি ডানপিটে বিমলের হাত চেপে ধ'রে বললুম, "তুমি কি পাগল হ'লে বিমল ? বিপদকে যেচে ডেকে আনবার কোন দরকার নেই !"

বিমল বললে. "আচ্ছা, আপনি যখন মানা করচেন, তখন আর যাব না !"

আমরা আবার অগ্রসর হলুম। আশে-পাশে আরো অনেক ঝোঁপ, জঙ্গল আর বন রয়েছে। কেন জানি না, সেগুলোর পাশ দিয়ে যেতে যেতে আমার বুকটা কেমন ছাঁৎ-ছাঁৎ ক'রে উঠতে লাগল। প্রতি পদেই মনে হ'তে লাগল, ঐ-সব বন-জঙ্গলের মাঝখানে সাক্ষাৎ মৃত্যু যেন আমাদের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে ব'সে আছে ! এক জায়গায় শুনতে পেলুম, বনের ভিতরে আবার সেই রকম ধপাস্‌-ধপাস্‌ ক'রে শব্দ হচ্ছে এবং প্রতি শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীর বুক কেঁপে কেঁপে উঠছে—বনের ভিতরে যেন কোন পর্ব্বতপ্রমাণ দানব

আপন মনে এধারে-ওধারে চলা-ফেরা ক'রে বেড়াচ্ছে যার পায়ের শব্দেই পৃথিবী কাঁপে, না জানি তার আকার কি ভয়ানক! একবার সে যদি মানুষের গন্ধ পায়, তাহ'লে আর কি আমাদের রক্ষা আছে?

আরব্য উপন্যাসের সিন্দবাদ একবার এক দৈত্যের কবলে পড়েছিল। গলিভার সাহেবের ভ্রমণ-কাহিনীতেও দৈত্য-মুল্লুকের কথা আছে। তবে কি সে-সব গল্প কাল্পনিক নয়, আমরা কি সত্যই কোন দৈত্যদের দেশে এসে পড়েছি? কিন্তু এ কথায় আমার মন বিশ্বাস করতে চাইলে না।

বিমল বললে, "বিনয়বাবু, আমরা তো কেউ এখানকার কিছুই চিনি না। কোন্ দিক নিরাপদ কি ক'রে আমরা তা জানতে পারব?"

বিমলের কথা সত্য। আমি চেয়ে দেখলুম, দক্ষিণ দিক—অর্থাৎ যেদিকে সমুদ্র আছে, সেদিকটা বেশ ফাঁকা। সেদিকে বনজঙ্গল নেই, কাজেই কোন লুকানো বিপদেরও ভয় নেই। তার উপরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে খুব বড় একটা পাহাড়ও আছে। মঙ্গল-গ্রহের মত এখানেও আমরা ঐ পাহাড়ের ভিতরে আশ্রয় নিতে পারব। সকলকে আমি সেই কথা

বললুম। সকলেই আমার প্রস্তাবে রাজি হ'ল। আমরা তখন সেই পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হলুম।

পাখী নেই, প্রজাপতি নেই, মানুষের সাড়া নেই, চারিদিকে খালি বন আর পাহাড় আর সমুদ্র। আমার মনে হ'ল, আমরা যেন বৈজ্ঞানিকদের পৃথিবীর সেই বাল্যকালে ফিরে এসেছি—যখন মানুষের নামও কেউ শোনে-নি, যখন পৃথিবীতে বাস করত সুধু প্রকাণ্ড, কিম্ভূতকিমাকার, আশ্চর্য্য সব জানোয়ার!

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলুম,—অনেক—অনেক উঁচুতে একঝাঁক পাখী উড়ে যাচ্ছে। তাহ'লে এদেশেও পাখী আছে! তাড়াতাড়ি আমি সকলের দৃষ্টি সেইদিকে আকর্ষণ করলুম।

বিমল বললে, "কিন্তু ওগুলো কি পাখী?"

কুমার বললে, "চিল।"

কমল বললে, "ঈগল।"

আমি বললুম, "কিন্তু চিল কি ঈগলের ডানা তো অত বড় হয় না!"

রামহরি বললে, "ওদের ল্যাজ কি-রকম দেখুন!"

তাইতো, তাদের ল্যাজগুলো চতুষ্পদ জীবের মত যে! কি পাখী ও গুলো?

ভালো ক'রে দেখবার আগেই পাখীর ঝাঁক ক্রমে দূরে মিলিয়ে গেল।

হঠাৎ পিছন থেকে কমল আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল! চকিতে ফিরে দেখি, কমলের পিঠের উপরে একটা অদ্ভুত আকারের জীব এসে বসেছে আর কমল প্রাণপণে সেটাকে পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুতেই পারছে না!

আমরা সকলে মিলে জীবটাকে মেরে ফেললুম। অদ্ভুত জীব! দেখতে মস্তবড় একটা ফড়িংয়ের মত—প্রায় একহাত লম্বা। কিন্তু তার মুখে সাঁড়াশীর মত দুখানা বড় বড় দাড়া রয়েছে আর তার দেহের দুই-ধারেও রয়েছে দুখানা ক'রে চারখানা হাত-দেড়েক লম্বা ডানা!

রামহরি বললে, "ও বাবা, এযে বোম্বাই-ফড়িং!"

কমলের দিকে চেয়ে দেখলুম, তার ঘাড়ের পিছনে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে!

কুমার হঠাৎ চেঁচিয়ে, একদিকে আঙুল তুলে বললে, "দেখ, দেখ!"

সেদিকে তাকাতেই দেখি গাছপালার ভিতর থেকে পালে পালে বোম্বাই-ফড়িং বেরিয়ে আসছে!

আমি বললুম, "পালাও, পালাও। ওরা আমাদের দেখতে পেলে আমরা কেউ আর বাঁচব না!"

সবাই বেগে দৌড়োতে লাগলুম—ফড়িং দেখে এর আগে মানুষ বোধ হয় আর কখনো পালায়নি!

তিন

পেটের ভাবনা

এই তো সমুদ্রতীর! উপরে নীলপদ্মের রং-মাখানো অনন্ত আকাশ, নীচে পৃথিবী-দেবীর পরোনের নীলাম্বরীর মতন অনন্ত নীল-সায়রের লীলা!

সমুদ্রের বুকের উপরে ব'সে সূর্য্যের আলো হাজার হাজার হীরা-মাণিক নিয়ে যেন ছিনিমিনি খেলছে, আমরা ব'সে ব'সে খানিকক্ষণ তাই দেখতে লাগলুম!

বিমল প্রথমে কথা কইলে। সে বললে, "বিনয় বাবু, এখন উপায় ?"

—"কিসের উপায় ?"

—"আমরা যে পৃথিবীতেই এসেচি, তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু এ কোন্ দেশ, এখান থেকে কোন্ দিকে, কত দূরে মানুষের বসতি আছে, তা আমরা জানি না। এখানে থাকাও সম্ভব নয়, কারণ কি খেয়ে বেঁচে থাকব ?"

আমি বললুম, "চেষ্টা করলে বনের ভিতরে শিকার মিলতে পারে।"

বিমল বললে, "হ্যাঁ, মিলতে পারে, কিন্তু তাও বন্দুকের টোটা না ফুরোনো পর্য্যন্ত।"

—"বিমল, টোটা ফুরোবার আগেই আমরা যে এ দেশ থেকে পালাবার পথ খুঁজে পাব না, এমন মনে করবার কোন কারণ নেই।"

—"কিন্তু শিকার পেলেও আমরা রাঁধব কি ক'রে? আমাদের সঙ্গে দেশলাই নেই, আগুন জ্বালতে পারব না।"

—"তা হ'লে আমাদের কাঁচা মাংস খাওয়াই অভ্যাস করতে হবে। মন্দ কি, সেও এক নূতনত্ব!"

রামহরি বললে, "বাবু, ভয় নেই, আপনাদের কাঁচা মাংস খেতে হবে না, আমি আপনাদের রেঁধে খাওয়াব!"

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললুম, "তুমি কোথা থেকে আগুন পাবে?"

রামহরি বললে, "কেন, ঐ পাহাড়ের পাশ দিয়ে আসতে আসতে আপনারা কি দেখেন নি, কত ছোট বড় চকমকি পাথর প'ড়ে রয়েচে!"

আমি আশ্বস্ত হয়ে বললুম, "যাক্, তাহলে আমাদের একটা বড় ভাবনা দূর হ'ল। ইস্পাতের জন্যে ভাবতে হবে না, আমাদের সঙ্গে ছোরা-ছুরি আছে, তাই দিয়েই কাজ চালিয়ে নেব।"

বিমল পেটের উপরে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, "ও বিনয়বাবু, শুনেই যে আমার ক্ষিধে পেয়ে গেল! এখন খাই কি?"

আমি হেসে বললুম, "শিকার না পেলে আমাদের হাওয়া খেয়েই বেঁচে থাকবার চেষ্টা করতে হবে।"

কুমার বললে, "কেন বিনয়বাবু, খাবার তো আমাদের সাম্‌নেই রয়েচে, হাত বাড়িয়ে নিলেই হয়!"

বিমল বললে, "সাম্‌নে! কোথায়?"

কুমার বললে, "ঐ দেখ!"

চেয়ে দেখলুম, আমাদের সুমুখে বালির উপরে, অনেকখানি জায়গা জুড়ে হাজার হাজার গর্ত্ত আর প্রত্যেক গর্ত্তের সাম্‌নে বসে রয়েছে এক-একটা লাল রঙের কাঁকড়া!

বিমল মহা-উল্লাসে একটা লাফ মেরে বললে, "কি আশ্চর্য্য, এতক্ষণ আমি দেখতে পাই-নি!"

আমরা সকলেই কাঁকড়া ধরতে ছুটলুম। কিন্তু

খানিকক্ষণ ছুটাছুটি ক'রেই বুঝলুম, কাজটা মোটেই সহজ নয়। তাদের কাছে যেতে না যেতেই তারা বিদ্যুতের মতন গর্ত্তের মধ্যে ঢুকে পড়ে, কিছুতেই ধরা দেয় না। তারা কেউ আত্মসমর্পনে রাজি নয় দেখে, আমরা শেষটা গর্ত্ত খুঁড়ে তাদের গোটাকতককে অনেক কষ্টে বন্দী করলুম।

গর্ত্ত খুঁড়তে-খুঁড়তে কমল হঠাৎ একরাশ ডিম আবিষ্কার করলে! মোট একশোটা ডিম!

আমি সানন্দে বললুম, "ব্যাস্, আর আমাদের খাবারের ভাবনা নেই! এগুলো কাছিমের ডিম!"

কমল বললে, "কাছিমের ডিম কি মানুষে খায়?"

—"নিশ্চয়ই খায়! দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন স্থানে কাছিমের ডিম আর মাংসই হচ্ছে মানুষের প্রধান খাদ্য! এখানে যখন কাছিমের ডিম পাওয়া গেছে, তখন আজ রাত্রে আমরা কাছিমও ধরতে পারব।"

বিমল বললে, "তাহলে দেখা যাচ্ছে, ভাগ্যদেবী এখনো আমাদের উপরে একেবারে বিমুখ হন-নি!"

কুমার বললে, "আর তো তর সইচে না—আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো!"

চার

সাগর-দানবের পাল্লায়

পাহাড়ের উপরে এখানেও একটা গুহা খুঁজে নিতে আমাদের বেশী দেরি লাগ্‌ল না। এ গুহাটির সব-চেয়ে সুবিধা এই যে, এর ভিতরটা বেশ লম্বা-চওড়া হ'লেও মুখটা এমন ছোট যে হামাগুড়ি না দিয়ে ভিতরে ঢুকবার উপায় নেই। কাজেই আত্মরক্ষার পক্ষে গুহাটি খুবই উপযোগী।

সমুদ্র-তীরে যেখানে কাছিমের ডিম পাওয়া গিয়েছিল, সন্ধ্যার পর আমরা আবার সেইখানে গিয়ে একখানা বড় পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রইলুম—কাছিম ধরবার জন্যে!

দক্ষিণ আমেরিকায় যে-ভাবে কচ্ছপ শিকার করা হয়, আমি কেতাবে তা পড়েছি। কচ্ছপদের স্বভাব হচ্ছে, ডাঙায় উঠে বালির ভিতরে ডিম পাড়া। রাত্রে দলে দলে তারা ডাঙায় ওঠে। স্ত্রী-কচ্ছপরা ডিম পেড়ে

বালির ভিতরে লুকিয়ে রাখে! এক-একটা কচ্ছপ একসঙ্গে আশী থেকে একশো-বিশটা পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে। তার পর ভোর হবার আগেই আবার তারা জলে ফিরে যায়।

শিকারীদের কাজ হচ্ছে, কচ্ছপদের ধ'রে উল্টে দেওয়া। তা হলে আর তারা পালাতে পারে না। উল্টে দেবার সময় একটু সাবধান হওয়া দরকার, যাতে কাছিমের ডানা বা মুখের কাছে শিকারীর হাত না পড়ে। কচ্ছপের কামড় বড় সুখের নয়, আর তার ডানার আঘাতও এমন জোরালো যে, এক আঘাতে মানুষের পায়ের হাড় মট্ ক'রে ভেঙে যায়!......এই সব কথা আমি সকলকে বুঝিয়ে দিতে লাগলুম।

আকাশে তখন একফালি চাঁদ দেখা দিয়েছে, কিন্তু তার আলো এত ক্ষীণ যে, অন্ধকার দূর হচ্ছে না। যে ভয়ানক বন থেকে আমরা পালিয়ে এসেছি, অনেক দূরে একটা জমাট কালো ছায়ার মতন তাকে দেখা যাচ্ছে। তার দিকে যতবার তাকাই, আমাদের বুক অমনি ডুরু-ডুরু ক'রে ওঠে! ও বনে যে কী আছে, ভগবান তা জানেন!

এমন সময়ে সাদা বালির উপরে একটা কালো

রেখা টেনে, প্রকাণ্ড একটা কচ্ছপ আমাদের খুব কাছে এসে, চারিদিকে একপাক ঘুরে এল।

বিমল তাকে তখনি ধরতে যাচ্ছিল আমি বাধা দিয়ে চুপিচুপি বললুম, "থামো, থামো! ওটা হচ্ছে কাছিমদের কর্ত্তা। ও আগে এসে চারিদিকে গণ্ডী কেটে রেখে যাচ্ছে। কর্ত্তা গিয়ে খবর দিলে পর আর সব কাছিম এসে এই গণ্ডীর ভিতরে আড্ডা গাড়বে। তারপর আমরা আক্রমণ করব।"

রামহরি বললে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐ যে কাছিম-ভায়া ফিরে যাচ্চেই তো বটে!"

আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না, কাছিম-কর্ত্তা ফিরে যাবার পরেই দলে দলে ছোট-বড় কচ্ছপ ডাঙার উপরে এসে উঠল।

তার পরেই আমাদের আক্রমণ! আমরা বেগে গিয়ে তাদের এক-একটাকে ধ'রে বালির উপরে চিৎ ক'রে ফেলে দিলুম। কাজটা অবশ্য খুব সহজ নয়, কারণ তাদের অনেকেই ওজনে প্রায় একমণ, কি আরো বেশী।

আমরা প্রায় গোটা-দশেক কাছিম বন্দী করলুম—বাকিগুলো জলে পালিয়ে গেল। আমরা আগেই

কতকগুলো শুকনো লতা সংগ্রহ ক'রে এনেছিলুম—বন্দীদের পা বাঁধবার জন্যে। সেই লতা দিয়ে আমরা তখনি তাদের বেঁধে ফেললুম।

বিমল বললে, "যাক্, এখন কিছুদিনের জন্যে আমাদের পেটের ভাবনা আর রইল না। এইবারে এ দেশ থেকে পালাবার কথা ভাবতে হবে!"

বিমলের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই ভীষণ এক বিকট চীৎকারে সমস্ত পৃথিবী যেন পরিপূর্ণ হয়ে গেল! উঃ, তেমন উচ্চ চীৎকার আমি জীবনে আর কখনো শুনি-নি,—যেন হাজারটা সিংহ একসঙ্গে এক স্বরে গর্জ্জন ক'রে উঠল!

সে অমানুষিক চীৎকারে আমাদের সমস্ত শরীর এলিয়ে পড়ল, কেউ আমাদের আক্রমণ করলেও তখন আমরা সেখান থেকে এক পা নড়তে পারতুম না!

আবার—আবার—আবার সেই আকাশ-ফাটানো গর্জ্জন,—একবার, দুইবার, তিনবার!

সমুদ্রের জল থেকে কী ওটা উঠে আসছে—কী ওটা, কী ওটা?

অস্পষ্ট আলোয় তাকে ভালো ক'রে বোঝা যাচ্ছে না—কিন্তু তার মাথা প্রায় তালগাছের সমান উঁচু,

আর তার দেহের তুলনায় হাতীর দেহও বিড়ালের সামনে নেংটি ইঁদুরের মত নগণ্য! সেই ভয়ানক সমুদ্র-দানবের চোখদুটো আলো-আঁধারির মধ্যে অগ্নি-শিখার মতন জ্ব'লে জ্ব'লে উঠছে!

আমি সভয়ে বললুম, "পালাও, পালাও!"

বিমল কাতর স্বরে বললে, "আমার পা-দুটো যে অসাড় হয়ে গেছে, পালাবার যে উপায় নেই!"

রামহরি একটা আর্ত্তনাদ ক'রে অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে গেল!

কুমার আর কমল দুই হাতে মুখ চেপে বালির উপরে ব'সে পড়ল!

আমার দুই চোখ যেন অন্ধ হয়ে গেল!

এখন উপায়?

পাঁচ

ডিপ্লোডোকাস?

জলের ভিতর থেকে সেই সৃষ্টিছাড়া জীবটা যখন প্রথম মাথা তুললে, তখন তাকে মনে হ'ল যেন একটা বিষম মোটা অজগর সাপের মত। কিন্তু এক মুহূর্ত্ত পরেই আবছায়ার মতন দেখা গেল তার বিরাট দেহ! তার চারটে পা এবং পা-গুলো তার দেহের তুলনায় খুব ছোট হ'লেও প্রত্যেক পা-খানা অন্ততঃ ছয়-সাত ফুটের চেয়ে কম উঁচু হবে না!

আমরা স্তম্ভিতের মতন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম, সেই সাগর-দানব ডাঙায় উঠে তার প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ ফুট লম্বা ল্যাজ বার-কতক বালির উপরে আছড়ালে, তারপর হঠাৎ নিজের হাতীর চেয়ে দ্বিগুণ লম্বা, চওড়া ও উঁচু দেহের উপরে একটা বিশফুট লম্বা অজগরের মতন গলা শূন্যে তুলে আবার তেমনি বাজের মতন চীৎকার করতে লাগল। সে-সময়ে তার মাথাটা

এত উর্দ্ধে উঠল যে পাশে কোন তিন-তালা বাড়ী থাকলেও তার ছাদের উপর থেকে সে অনায়াসে শিকার ধরতে পারত।

তার ভীষণ চীৎকারে রামহরির মূর্চ্ছা আপনি ছুটে গেল। সে চীৎকারে মৃতের চির-নিদ্রাও বোধ হয় ভেঙে যায়, রামহরির মূর্চ্ছা তো সামান্য কথা।

তবু আমরা কেউ পালাতে পারলুম না—যেন এক অসম্ভব দুঃস্বপ্ন দেখে আচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়ে রইলুম।

তারপরেই আচম্বিতে চীৎকার থামিয়ে সেই ভীষণ জীবটা ঝপাং ক'রে আবার সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল,—দেখতে দেখতে তার দেহের সমস্তটা আবার অদৃশ্য হয়ে গেল, জলের উপরে জেগে রইল সুধু তার অজগরের মতন মাথা এবং গলার খানিকটা। ঐ মাথা ও গলার তলায় যে কি প্রকাণ্ড ও অদ্ভুত দেহ আছে, তাকে তখন দেখলে কেউ তা কল্পনা করতে পারত না।

এতক্ষণে আমাদের সাড় হ'ল। আমি বললুম, "জীবটা বোধ করি আমাদের দেখতে পায় নি,—এইবেলা পালাই চল।"

তারপরেই আমরা সবাই একসঙ্গে তীরের মতন

পাহাড়ের দিকে ছুট দিলুম,—একেবারে গুহার সামনে না গিয়ে দাঁড়াতে ভরসা করলুম না। বিমল রুদ্ধশ্বাসে বললে, "বিনয়বাবু একি দেখলুম।"

—"আমিও তাই ভাবচি।"

রামহরি দুইহাত কপালে চাপড়ে বললে, "আর ভেবে কি হবে, এখানে আর আমাদের নিস্তার নেই।"

কুমার হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করলে, "বিনয়-বাবু, মঙ্গল ছাড়া আর কোন গ্রহে কি জীবের বসতি আছে?"

আমি বললুম, "থাকতেও পারে।"

—"আমরা তাহ'লে অন্য কোন গ্রহে এসে পড়েচি।"

—"কেন তুমি এ অনুমান করচ?"

—"পৃথিবীতে এ রকম ভয়ানক জীবের কথা কেউ কখনো শুনেচে?"

কমল বললে, "উঃ। ভাবতেও আমার বুক ঢিপ ঢিপ করচে।"

আমি বললুম, "আমরা যে পৃথিবীতে এসেচি, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই। এ রকম সাগর-

৩

দানবের কথা আমরা আর কখনো শুনি নি বটে, কিন্তু এই বিপুল পৃথিবীর কোথায় কি আছে, মানুষ তার সব রহস্য তো জানে না। তবে যে-জীবটিকে আমরা এখনি দেখলুম, এটি নিশ্চয়ই 'প্রাগৈতিহাসিক' জীব। প্রাগৈতিহাসিক কি জানো তো? যে-যুগের ইতিহাস পাওয়া যায় না, সেই-যুগকে ইংরেজীতে বলে Pre-historic যুগ। এই Pre-historic কথাটিকে বাংলায় বলে 'প্রাগৈতিহাসিক'।"

বিমল বললে, "হ্যাঁ, সে যুগের কথা আমি কেতাবে পড়েচি। পৃথিবীর সেই আদিম যুগে, যখন মানুষের জন্ম হয় নি, তখন জলে, স্থলে, আকাশে নানান অদ্ভুত আকারের জীবজন্তু বিচরণ করত। তখনকার অনেক জলচর আর স্থলচর জীবের আকার ছিল ছোটখাট পাহাড়েরই মত বড়। তাদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কঙ্কাল এখনো মাটি খুঁড়লে পাওয়া যায়। কিন্তু বিনয়বাবু, সে-সব জীব তো মানুষ জন্মাবার আগেই পৃথিবী থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে?"

আমি বললুম, "এ কথা জোর ক'রে বলা যায় না। পৃথিবীতে এখনো এমন অনেক স্থান আছে, মানুষ যেখানকার কথা কিছুই জানে না। সে-সব জায়গায়

কি আছে আর কি না আছে, কে তা বলতে পারে? মাঝে মাঝে ভ্রমণকারীদের বর্ণনায় পড়া যায়, পৃথিবীর স্থানে স্থানে কেউ কেউ সেকেলে জানোয়ারদের মত অসম্ভব আকারের জানোয়ার স্বচক্ষে দর্শন করেচে। সে কথা অনেকেই বিশ্বাস করেন না বটে, কিন্তু কথাটা যে মিথ্যা, এমন প্রমাণও তো নেই! এই যে আমরা আজ একটা অদ্ভুত জীব দেখলুম, এটাকে তো চোখের ভ্রম ব'লে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না! প্রাগৈতিহাসিক বা সেকেলে জীবদের অনেক কাহিনী আমি পড়েচি। সেকালে "ডিপ্লোডোকাস" ব'লে এক প্রকাণ্ড জানোয়ার ছিল। আজ যে সাগর-দানবকে আমরা দেখেচি, তার সঙ্গে ঐ "ডিপ্লোডোকাসের" চেহারা আশ্চর্য্য রকম মিলে যায়! কিন্তু আজ অনেক রাত হয়েচে, এ-সব কথা এখন থাক্। ভেবে-চিন্তে এ-সম্বন্ধে আমার যা ধারণা, পরে তা তোমাদের কাছে জানাব। এখন এস, ঘুমের চেষ্টা দেখা যাক্ গে।"

ছয়

আবার বিপদ

পরদিন সকাল বেলায় আমরা ভয়ে ভয়ে আবার সমুদ্রের ধারে গেলুম—বন্দী কচ্ছপগুলোকে ধ'রে আনবার জন্যে।

সৌভাগ্যের কথা, সাগর-দানবের আর কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। কেবল যে-স্থানে দাঁড়িয়ে সে লাঙ্গুল আস্ফালন করেছিল, সেখানটায় দেখা গেল, বালির ভিতরে মস্ত একটা গর্ত্ত হয়েছে! সে গর্ত্তের ভিতরে অনায়াসেই দশ-বারোজন লোককে কবর দেওয়া যায়। যার ল্যাজেই এত জোর, তার গায়ের জোর যে কত, আমরা তা কল্পনাও করতে পারলুম না!

বালির উপরে সাগর-দানবের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পায়ের দাগও আমাদের চোখে পড়ল!

হঠাৎ কমল ব'লে উঠল, "একি! মোটে তিনটে কচ্ছপ রয়েচে! অন্যগুলো গেল কোথায়?"

মোটে তিনটে কচ্ছপ! বেশ মনে আছে, আমরা দশটা কচ্ছপ ধ'রে ছিলুম! তারা যে বাঁধন খুলে সমুদ্রে পালায় নি তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই। কারণ তাদের পিঠের শক্ত খোলগুলো ভাঙা-চোরা অবস্থায় সেখানেই ছড়িয়ে প'ড়ে ছিল। কোন জীব এসে যে তাদের মাংস খেয়ে গেছে, এটা বুঝতে আমাদের কিছুমাত্র বিলম্ব হ'ল না।

আমি ভাবলুম নিশ্চয়ই এ সাগর-দানবের কীর্ত্তি!

কিন্তু বিমল চেঁচিয়ে বললে, "বিনয়বাবু, বিনয়বাবু, দেখে যান।"

বিমলের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সে নীচের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করলে। চেয়ে দেখলুম, বালির উপরে বড় বড় পায়ের দাগ;

বিমল বললে, "দেখচেন, এগুলো সাগর-দানবের পায়ের দাগ নয়?"

হ্যাঁ, এ পায়ের দাগ একেবারে অন্য রকম। তবে এও নিশ্চয় আর একটা বিরাটদেহ দানবের পদচিহ্ন, কারণ প্রত্যেকটি পায়ের দাগ লম্বায় অন্ততঃ তিন ফুটের চেয়ে কম নয়! উঃ, না জানি এ জীবটার আকার কী প্রকাণ্ড! প্রতি চারটে ক'রে পায়ের দাগের মাঝখানে

আবার আর একটা ক'রে লম্বা-চওড়া অদ্ভুত দাগ রয়েছে! ভালো ক'রে দেখে বুঝলুম, এটা সেই অজানা দানবেরই বিপুল লাঙ্গুলের চিহ্ন।

বিমল সেই পায়ের দাগ অনুসরণ ক'রে অগ্রসর হ'ল। রামহরি, কুমার আর কমলকে সেইখানেই অপেক্ষা করতে ব'লে আমিও বিমলের পিছনে পিছনে চললুম।

যেতে যেতে বিমল বললে, "বিনয়বাবু, যার পায়ের দাগ আমরা দেখচি সেইই নিশ্চয় কচ্ছপগুলোকে খেয়ে ফেলেচে।"

—"আমারও তাই বিশ্বাস।"

—"কিন্তু অত বড় বড় সাত-সাতটা কচ্ছপ একসঙ্গে খাওয়া তো যে সে জীবের কর্ম্ম নয়!"

—"তা তো নয়ই। কিন্তু তুমি কোথায় যাচ্ছ বিমল?"

—"জীবটা কোথায় থাকে, তাই দেখতে। কোন্-দিক থেকে বিপদ আসবার সম্ভাবনা, সেটা জেনে রাখা ভালো।"

আমি আর কিছু না ব'লে বিমলের সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগলুম।

আমরা প্রায় এক মাইল পথ পার হয়ে এলুম। পায়ের দাগের রেখা তখনো ঠিক সমানই চলেছে! খানিক তফাতেই একটা ছোটখাটো বন রয়েছে, পায়ের দাগ গেছে সেই দিকেই।

আমি বললুম, "বিমল জন্তুটা যে ঐ বনের ভেতরেই থাকে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে, আমাদের আর অগ্রসর হবার দরকার নেই।"

বিমল কি-একটা জবাব দিতে গিয়ে হঠাৎ থেমে পড়ল, তারপর বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে একদিকে তাকিয়ে রইল।

যেদিকে সে চেয়ে আছে সেইদিকে তাকিয়ে আমিও যেন থ হয়ে গেলুম!

একটু দূরেই হাড়গোড়-ভাঙা 'দ'য়ের মতন একটা গাছ একলা দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং তারই তলায় ব'সে বিচিত্র এক জানোয়ার আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

চোখের সামনে দেখলুম যেন ভীষণতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি! এ জীব যেন ভগবানের সৃষ্টির বাইরেকার! তার মুখখানা অনেকটা কুমীরের মত, সামনের পাদুটো ছোট, পিছনের পাদুটো বড়, আর তার মোটাসোটা ল্যাজটা দেখতে কাঙ্গারুর মতন।

তার দেহ অন্ততঃ ত্রিশ হাতের চেয়ে কম হবে না!

হঠাৎ সে ল্যাজ আর পিছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, তারপর বিকট এক অপার্থিব চীৎকার ক'রে ঠিক কাঙ্গারুর মতন এক লাফ মারলে! অত-বড় দেহ নিয়ে কোন জীব যে অমন ক'রে লাফ মারতে পারে, না দেখলে আমি তা বিশ্বাস করতে পারতুম না!

বিমল সভয়ে ব'লে উঠল, "ওযে আমাদের দিকেই আসচে! পালান—পালান!"

আমরা দুজনে প্রাণপণে ছুটলুম—আর সেই কুমীর কাঙ্গারুও ঠিক তেম্‌নি ক'রেই শূন্যে লাফ মারতে-মারতে আমাদের অনুসরণ করলে! মাঝে মাঝে তার ভীষণ চীৎকার শুনে আমার গায়ের রক্ত যেন জল হয়ে যেতে লাগল!

সাত

বিমলের বীরত্ব

আমরা দুজনে ছুটছি, ছুটছি, আর ছুটছি!

আমাদের পিছনে লাফাতে লাফাতে আস্‌ছে সাক্ষাৎ মৃত্যুর মত সেই ভয়ানক জানোয়ারটা!

প্রতি লম্ফেই সে আমাদের বেশী কাছে এসে পড়ছে!

ছুটতে ছুটতে চেয়ে দেখলুম, তার সেই কুমীরের মত প্রকাণ্ড মুখখানা একবার খুলছে আর একবার বন্ধ হচ্ছে এবং তার ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে, লাল টক্‌টকে হল্‌হলে একখানা জিভ ও দুইসার ভীষণ দাঁত! অত বড় দেহের পক্ষে তার চোখদুটো খুব ছোট বটে, কিন্তু কি ক্রূর, কি নিষ্ঠুর সেই চোখের দৃষ্টি!

—হঠাৎ কিসে হোঁচট খেয়ে আমি ঘুরে প'ড়ে গেলুম! দারুণ যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ ক'রে তখনি আমি দাঁড়িয়ে উঠলুম বটে,—কিন্তু ছুটতে গিয়ে আর ছুটতে পারলুম না।

বিমলও দাঁড়িয়ে প'ড়ে বললে, "একি বিনয়বাবু, হ'ল কি ?"

যাতনায় মুখ বিকৃত ক'রে আমি বল্লুম, "আমি আর ছুটতে পারচি না বিমল ! আমার ডান পা মুচ্ড়ে একেবারে এলিয়ে পড়েচে !"

বিমল সভয়ে বললে, "তা হলে উপায় ?"

আমি আবার পিছনে চেয়ে দেখলুম ! সেই দানবটা তখন আমাদের কাছে এসে পড়েছে, আর কয়েকটা লাফ মারলেই সে একেবারে আমাদের ঘাড়ের উপরে এসে পড়বে।

আমি প্রাণের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে বললুম, "বিমল, শীগ্গির পালাও !"

বিমল বললে, "আপনাকে এখানে ফেলে ? এমন কাপুরুষ আমি নই !"

—"বিমল, বিমল, আমার জন্যে তুমি মরবে কেন ? এখনো সময় আছে, এখনো পালাও !"

বিমল দৃঢ়স্বরে বললে, "মরতে হয়তো দুজনেই এক সঙ্গে মরব, কিন্তু আপনাকে ফেলে কিছুতেই আমি পালাতে পারব না"—এই ব'লেই সে বন্দুক তুলে ফিরে দাঁড়াল।

তার অদ্ভুত সাহস ও বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে আমি বললুম, "কিন্তু বিমল, তোমার ঐ সামান্য বন্দুকের গুলিতে এত-বড় ভীষণ জন্তুর কোন ক্ষতি হবে না,—এখনো পালাও, নইলে আমরা দুজনেই একসঙ্গে মরব!"

—"দেখা যাক্" ব'লে সে বন্দুকের লক্ষ্য স্থির করতে লাগল।

সেই ভয়াবহ কুমীর-কাঙ্গারু তার পিছনের দুই পা ও ল্যাজে ভর দিয়ে লাফের পর লাফ মারতে মারতে তখনো এগিয়ে আসছে! সেই অতি বিপুল দেহের উপরে একটা পাহাড় ভেঙে পড়লেও তার কোন আঘাত লাগে কি না সন্দেহ, বিমলের এতটুকু বন্দুকের গুলিতে তার আর কি অনিষ্ট হবে?

এ যাত্রা আর বোধ হয় রক্ষা নেই—আমি তো মরবই, আমার জন্যে বিমলকেও প্রাণ দিতে হবে!

ভাবছি, এমন সময়ে বিমলের বন্দুক গর্জ্জন ও অগ্নি উদ্গার করলে!

—সঙ্গে সঙ্গে দানবটাও থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল!

বিমল আবার বন্দুক ছুঁড়লে।

দানবটা আকাশের দিকে মুখ তুলে বজ্রনাদের মতন দুইবার গর্জ্জন করলে, তারপর লাফাতে লাফাতে

আবার যে পথে এসেছিল সেইদিকেই বেগে পলায়ন করতে লাগল!

বিমল মহা উল্লাসে ব'লে উঠল, "বিনয়বাবু, আর আমাদের ভয় নেই!"

আমি হাত বাড়িয়ে তাকে বুকের ভিতরে টেনে নিয়ে বললুম, "বিমল, তোমার সাহসেই আমার প্রাণ রক্ষা হ'ল।"

বিমল বললে, "কিন্তু ছুটো গুলি খেয়ে ঐ জানোয়ারটা যদি ভয় পেয়ে না পালাত, তাহ'লে আমরা কেউই বাঁচতুম না! আপনি ঠিক কথাই বলেচেন, বন্দুকের গুলিতে ওর বিশেষ কিছুই ক্ষতি হবে না!"

আমি বললুম, "কিন্তু ওকে দেখে বুঝতে পারচ কি, ও একালের জীব নয়? প্রাগৈতিহাসিক কালের যে যুগকে পণ্ডিতরা সরীসৃপ-যুগ বলেন, ওর আকার সেই যুগের জীবের সঙ্গে অবিকল মিলে যাচ্চে! বিমল, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা পৃথিবীর এমন কোন স্থানে এসে পড়েচি, যেখানে কোন অজানা কারণে পৃথিবীর সেকালের জীবরা এখনো বর্ত্তমান আছে। এ এক অভাবিত আবিষ্কার! এ সংবাদ জানতে পারলে সারা পৃথিবীতে মহা আন্দোলন জেগে উঠবে!"

বিমল বললে, "কিন্তু এই আবিষ্কারের বার্ত্তা নিয়ে আমরা কি আবার সভ্যজগতে ফিরে যেতে পারব ?"

আমি বললুম, "আজ যে জীবটার বিরুদ্ধে তুমি একাই দাঁড়াতে ভরসা করলে, ও-জীবটা যদি হঠাৎ পৃথিবীর কোন সহরে গিয়ে হাজির হয়, তবে ওর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখে সহরশুদ্ধ লোক নিশ্চয়ই সহর ছেড়ে পলায়ন করবে! তোমার মতন বীর যখন আমাদের মধ্যে আছে, তখন আমরা এদেশ থেকে বিজয়ীর মতন ফিরতে পারব না কেন বিমল ?"

বিমল সলজ্জ কণ্ঠে বললে, "বিনয়বাবু, আপনি বার বার ঐ কথা তুলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। দেখি, আপনার পায়ের কোন্ খানটা মুচকে গেছে ?"

আট

গরুড়-পাখী

সেদিন গুহায় ফিরে এসে দেখলুম, কুমার, কমল আর রামহরি রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত হ'য়ে আছে!

রামহরি ভিজে মাটির তাল দিয়ে কতকগুলো ছোট-বড় পাত্র তৈরি ক'রে সেগুলোকে পুড়িয়ে শক্ত ক'রে নিয়েছিল। উনুন তৈরি করতেও সে ভোলে নি। সমুদ্রের জল যখন আছে, তখন লবণেরও অভাব হয়-নি। কাজেই অন্য কোন মশলা না থাকলেও এত বিপদের পরে কচ্ছপের সিদ্ধ মাংস আর ডিম আজ বোধ হয় নিতান্ত মন্দ লাগবে না।... ... ...

সত্যিই মন্দ লাগল না! বেশী আর কি বলব, রামহরির রান্না আজ এত ভালো লাগল যে আমার মনে হ'ল, সহরে নিশ্চিন্তভাবে ব'সেও এর চেয়ে ভালো সুস্বাদু খাবার আর কখনো খাই-নি! ... ...

দিন-তিনেক আমরা কেউ আর পাহাড় থেকে নীচে

নামলুম না, বেশীর ভাগ সময়ই গুহার ভিতরে ব'সে ব'সে গল্পগুজবে আর পরামর্শেই কাটিয়ে দিলুম।

আজ বৈকালে আমরা ঠিক কর্‌লুম, পাহাড়ের সব-উঁচু শিখরে উঠে দেখে আসব, যে দেশে আমরা এসে পড়েছি তার চারিদিকের দৃশ্য কি-রকম দেখতে।

যথাসময়ে উপত্যকার ভিতর দিয়ে আমরা পাহাড়ের উপরে উঠতে সুরু করলুম। তখনো আমার পায়ের ব্যথা সারে নি, কাজেই আমার বেশ কষ্ট হ'তে লাগল। কিন্তু সে কষ্ট আমি মুখে প্রকাশ করলুম না।

প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে, উপত্যকার গর্ভ ছেড়ে আমরা পাহাড়ের একটা উঁচু শিখরের উপরে গিয়ে দাঁড়ালুম।

চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌লুম, সমস্ত দেশটা আমাদের পায়ের তলায় ঠিক যেন 'রিলিফ' ম্যাপের মতন প'ড়ে রয়েছে!

সর্ব্বপ্রথমেই একটি সত্য আমাদের চোখের সাম্‌নে জেগে উঠল,—আমরা যেখানে এসে পড়েছি, সেটি একটি দ্বীপ! কারণ পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ,—আমাদের সবদিকেই আকাশের সীমা-রেখা পর্য্যন্ত অনন্ত সাগরের নীল জল খেলা করছে!

দ্বীপের প্রায়-পূর্ব্ব-দিকে সেই বিশাল ও নিবিড়

বন—যেখানে এসে আমরা প্রথমে অবতীর্ণ হয়েছিলুম। আমরা বেশ বুঝলুম, দ্বীপের সমস্ত বিভীষিকা ঐ নিবিড় অরণ্যের ভিতরেই লুকানো আছে, কিন্তু এখান থেকে তার সুন্দর শ্যামলতা ছাড়া আর কিছুই আমাদের নজরে পড়ল না।

অরণ্যের এক পাশে মস্ত-একটা হ্রদ। তার তীরে তীরে নানাজাতীয় পাখী বিচরণ করছে। দূর থেকে সেগুলো কি পাখী, তা কিন্তু বোঝা গেল না।

বিমল উৎসাহ-ভরে বললে, "কালকেই আমি বন্দুক নিয়ে ওখানে গিয়ে দু-একটা পাখী শিকার ক'রে আনব!"

কুমার হেঁট হ'য়ে নীচের দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বললে, "দেখ দেখ, এখানে আবার কি বিট্‌কেল জীব ব'সে আছে!"

পাহাড়ের ধারে গিয়ে দেখি, আমাদের ঠিক নীচেই চারটে অদ্ভুত আকারের জীব পাথরের মূর্ত্তির মত নিথর হয়ে চুপ ক'রে পাশাপাশি ব'সে আছে! তাদের গায়ের রং ধূসর, চোখগুলো ভাঁটার মত গোল গোল, রক্তবর্ণ! তাদের আকার প্রায় পাঁচ ছয় ফুট লম্বা এবং তাদের দেহের দু-পাশে দু-খানা ডানা ও তলার

দিকে একটা দড়ীর মতন ল্যাজ ঝুলছে! মুখ দেখলে তাদের পাখী ব'লে মনে হয় বটে, কিন্তু কারুর গায়েই পালকের চিহ্নমাত্র নেই! তাদের দেখতে এমন বীভৎস যে, আমার বুকের কাছটা থর্ থর্ ক'রে কেঁপে উঠল।

হঠাৎ তারাও আমাদের দেখতে পেলে! বিশ্রী এক চীৎকার ক'রে তারা তখনি ডানা ছড়িয়ে উড়তে সুরু করলে। তাদের দুই ডানার বিস্তার অন্ততঃ পনের হাতের কম হবে না—আমার মনে হ'তে লাগল, যেন এক একটা চতুষ্পদ প্রকাণ্ড জন্তু চার পায়ে ডানা বেঁধে শূন্যে উড়ছে! তাদের দীর্ঘ চঞ্চুর ভিতর থেকে ধারালো ও বড় বড় দাঁতের সারিও আমরা স্পষ্ট দেখতে পেলুম!

রামহরি ব'লে উঠল, "এ কি গরুড়-পাখী?"

রামহরির নাম দেবার শক্তি আছে বটে! এই কিম্ভূতকিমাকার উড়ন্ত জীবগুলোকে সত্যসত্যই অনেকটা গরুড়ের মতই দেখাচ্ছিল!

প্রথমটা তারা আমাদের মাথার উপর চক্র দিয়ে একবার ঘুরে গেল,—তারপর হঠাৎ তাদের একটা তীরের মতন নীচের দিকে ঝাঁপ দিলে!

আমরা সাবধান হবার আগেই সে হুস ক'রে

বিমলের ঘাড়ের উপরে এসে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে তার প্রকাণ্ড ডানা ও দেহের ধাক্কায় বিমল পাহাড়ের একদিকে ঠিক্‌রে চিৎ হয়ে প'ড়ে গেল!

কাছেই কুমার ছিল, সে তার বন্দুকের কুঁদো দিয়ে সেই জীবটার গায়ের উপরে এক ঘা বসিয়ে দিলে। জন্তুটা কর্কশ চীৎকারে চারিদিক কাঁপিয়ে সেই মুহূর্ত্তে ফিরে তাকে আক্রমণ করলে,—কুমার আবার তাকে মারবার জন্যে বন্দুক তুললে, সে কিন্তু তার আগেই কুমারের একখানা হাত কাম্‌ড়ে ধরলে এবং চোখের পলক না ফেল্‌তে কুমারকে মাটি থেকে টেনে তুলে শূন্যের দিকে উঠল!

এত-শীঘ্র ব্যাপারটা ঘটল যে, আমরা সাহায্য করবার জন্যে একখানা হাত পর্য্যন্ত তোলবার সময় পেলুম না!

কুমার আর্ত্তনাদ ক'রে উঠল, "বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও!"

নয়

উড়ন্ত সরীসৃপ

ঠিক আমার সুমুখ দিয়েই কুমারের দেহটা শূন্যে উঠে যেতে লাগল।

কুমার আবার আর্ত্তস্বরে চীৎকার করলে, "বাঁচাও, বাঁচাও!"

আমার বিস্ময়ে চমকটা ভেঙে গেল! তখনো কুমারের দেহ নাগালের বাইরে গিয়ে পড়ে-নি,—সামনের দিকে একলাফে এগিয়ে হাত বাড়াতেই আমি কুমারেরপা দুটো মুঠোর ভিতরে পেলুম এবং প্রাণপণে তাই ধ'রে টানতে লাগলুম।

কিন্তু এই গরুড়-পাখীর গায়ে কি ভয়ানক জোর! সে কুমারের সঙ্গে আমাকেও প্রায় উপরে টেনে তোলবার উপক্রম করলে, ভাগ্যে আমি বাম হাতে পাহাড়ের একটা গাছের ডাল চেপে ধ'রে আর ডান হাতে কুমারের:পা ধ'রে দেহের সমস্ত শক্তি এক ক'রে

টানতে লাগলুম, নইলে আমাকেও কম মুস্কিলে পড়তে হ'ত না।

এদিকে আবার বিপদের উপর নূতন বিপদ! আমি যখন কুমারকে আর নিজেকে নিয়ে এমনি বিব্রত হ'য়ে আছি, তখন আর-একটা গরুড়-পাখী হঠাৎ তীরের মতন আমার উপরে ছোঁ মেরে পড়ল! সে তার প্রকাণ্ড ডানা দিয়ে আমাকে এমন প্রচণ্ড এক ঝাপটা মারলে যে, কুমারের পা তো আমার হাত থেকে ফস্‌কে গেল বটেই, তার উপরে আমি নিজেও দুই চোখে সর্ষেফুল দেখে তিন চার হাত দূরে ছট্‌কে গিয়ে পড়লুম!

—সেই সঙ্গেই গুড়ুম ক'রে বন্দুকের আওয়াজ হ'ল!

তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে দেখি খানিক তফাতেই একটা গরুড়পাখী দুই ডানা ছড়িয়ে পাহাড়ের উপরে নিশ্চেষ্ট হয়ে প'ড়ে আছে এবং তার পাশেই রয়েছে কুমারের দেহ। সে দেহ মড়ার মতন স্থির।

বিমল আর রামহরি তাড়াতাড়ি কুমারের কাছে ছুটে গেল। বিমল তাকে পরীক্ষা ক'রে বললে, "না, কোন ভয় নেই। কেবল অজ্ঞান হয়ে গেছে।"

মাথার উপরে তাকিয়ে দেখলুম, বাকি তিনটে গরুড়-পাখী তখনো শূন্যে চক্র দিয়ে আমাদের কাছে কাছেই ঘুরছে-ফিরছে।

কুমারের বন্দুকটা আমার সাম্‌নেই প'ড়ে ছিল, আমি তখনি সেটা তুলে নিয়ে লক্ষ্য স্থির ক'রে ঘোড়া টিপলুম! লক্ষ্য ব্যর্থ হ'ল না। আর একটা পাখী ঘুরতে ঘুরতে নীচে প'ড়ে পাহাড়ের ভিতর কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল! বাকি পাখীদুটো ভয় পেয়ে বিশ্রী চীৎকার করতে করতে ক্রমেই উপরে উঠে যেতে লাগল।

খানিক পরেই কুমারের জ্ঞান হ'ল। গরুড়-পাখীর কামড়ে তার বাম হাতখানা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল, এছাড়া তার আর বিশেষ-কিছু অনিষ্ট হয়-নি।

বিমল মরা গরুড়-পাখীটার দিকে অনেকক্ষণ ধ'রে অপলক-চোখে তাকিয়ে থেকে বললে, "কি আশ্চর্য্য জীব!"

আশ্চর্য্য জীবই বটে! অতি-বড় দুঃস্বপ্নেও এমন কিম্ভূতকিমাকার চেহারা দেখা যায় না!

কুমার বললে, "এটা কি জীব বিনয়বাবু? এর

ডানা আছে বটে, কিন্তু দেহের আর কোন জায়গাই পাখীর মতন নয়! এর চঞ্চুতে কত বড় বড় দাঁত দেখুন! দেহটা প্রায় গিরগিটির মতন, আর গায়ের কোথাও পালোকের চিহ্নমাত্র নেই।"

বিমল বললে, "আকারেও এ জীবগুলো প্রায় মানুষের মতই বড় আর ডানা দুখানাও প্রায় পনেরো হাত লম্বা! সিন্দবাদের গল্পে রক্‌পাখীর কথা পড়েচি। সেও মানুষকে ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে পারত। এটা রক্‌পাখী নয় তো?"

আমি বললুম, "না। আসলে এটা পাখীই নয়। এদের উপরে দুখানা হাত আর নীচে দুখানা পা আছে। প্রত্যেক হাতে চারটি ক'রে আঙুল। চতুর্থ আঙুলটা লম্বা হয়ে গেছে, আর তাতেই জালের মতন ডানাখানা ঝুলচে। পাখীর ডানার গড়ন এ-রকম হয় না।"

কুমার বলল, "পাখী নয় তো এটা কি?"

আমি বললুম, "উড়ন্ত সরীসৃপ। এও একরকম সেকেলে জীব। পণ্ডিতরা এর নাম দিয়েচেন Pterodactyl। কিন্তু আমরা একে গরুড়-পাখী ব'লেই ডাকব।"

সেই দিন সন্ধ্যাবেলাতেই কুমারের কম্প দিয়ে

জ্বর এল। গরুড়পাখীর দাঁতে নিশ্চয়ই কোনরকম বিষ আছে! তার হাতখানাও বিষম ফুলে উঠল। একে এই অজানা দেশ, তায় সঙ্গে কোন ঔষধ নেই, কাজেই কুমারের জন্যে প্রথমটা আমাদের মনে বড় ভাবনা হ'ল।

যা হোক্, প্রায় দিন-পনেরো ভুগে কুমার সে-যাত্রা প্রাণে প্রাণে বেঁচে গেল, আমরাও আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।

দশ

ডাইনসরের পাল

গুহার বাইরে একখানা পাথরের উপরে আমি আর বিমল চুপ ক'রে ব'সেছিলুম।

সন্ধ্যা হয়-হয়। পশ্চিমের মেঘে মেঘে থরে থরে আবির সাজিয়ে সূর্য্যদেব আজ্‌কের মতন ছুটি নিয়েছেন এবং সেই রঙিন মেঘগুলির ছায়া সমুদ্রের নীলপটের উপরে দেখাচ্ছিল যেন ঠিক জলছবির মতন।

চারিদিকের স্তব্ধতার ভিতরে আমার মন আজ কেমন-কেমন করতে লাগ্‌ল! কোথায় আমাদের শ্যাম্‌লা বাংলা দেশ, আর কোথায় আমরা প'ড়ে আছি! এমন শান্ত সন্ধ্যার সময়ে বাংলাদেশের পল্লীতে পল্লীতে কত শঙ্খের সাড়া জেগে উঠেছে, বধূরা তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করছে, ছেলের দল ঠাকুরঘরে ভিড় ক'রে আরতির সময়ে কাঁসর বাজাবার জন্যে পরস্পরের সঙ্গে কাড়াকড়ি লাগিয়ে দিয়েছে!

এমন সময়ে বিমল হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, “বিনয়বাবু, একটা কথা ভেবে দেখেচেন কি ?”

আমার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, “কি বিমল ?”

—“কাছিমের ডিম আর মাংস দুইই ফুরিয়ে গেছে। এবার কি খেয়ে আমরা বাঁচব ?”

—“আবার কাছিম ধরতে হবে।”

বিমল খানিকক্ষণ পূর্ব্বদিকে তাকিয়ে রইল। সেখানকার নিবিড় অরণ্য তখনো অস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছিল।

বিমল আঙুল দিয়ে সেই দিকটা দেখিয়ে বললে, “তার চেয়ে ঐ দিকে চলুন।”

—“কেন ?”

—“ওখানে কোন নতুন শিকার মেলে কিনা দেখা যাক্। রোজ রোজ কাছিমের মাংস আর ভালো লাগে না। সেদিন পাহাড়ে উঠে দেখেছিলেন তো, ঐ বনের পাশে মস্ত-একটা হ্রদ আছে ? ঐ হ্রদের আশেপাশে নিশ্চয়ই নূতন কোন শিকারের সন্ধান পাওয়া যাবে।”

—“সঙ্গে সঙ্গে নতুন কোন বিপদেরও সন্ধান মিলতে পারে।”

—"বিনয়বাবু, বিপদ এ দ্বীপের কোথায় নেই? কাছিম ধরতে গেলেও তো আবার সাগর-দানবের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা আছে! বিশেষ, এ দ্বীপের কোথায় কি আছে না আছে, সেটা আমাদের জেনে নেওয়া দরকার। নইলে এখানে আমাদের বেঁচে থাকা সহজ হবে না!"

বিমলের কথা যুক্তিসঙ্গত বটে! কাজেই আমি সায় দিয়ে বললুম, "আচ্ছা বিমল, তোমার প্রস্তাবে আমি রাজি!"

পরদিন সূর্য্য ওঠবার আগেই আমি, বিমল আর রামহরি গুহার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়লুম। কুমার তখনো ভালো ক'রে সেরে ওঠেনি ব'লে তাকে কমলের তত্ত্বাবধানে গুহাতেই রেখে গেলুম। বাঘা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই চল্‌ল। কুমারের বন্দুকটা নিলুম আমি।

সমুদ্রের জলে স্নান ক'রে ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া সেই নিস্তব্ধ মাঠের ভিতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছিল, সে হাওয়া আমার বড়ই মিষ্টি লাগল। খানিক পরেই সুদূরের সবুজ বনের মাথায় স্বর্গীয় মুকুটের মতন সূর্য্যের মুখ জেগে উঠল।

রামহরি বললে, "খোকাবাবু, তুমি কি আবার ঐ ময়নামতীর মায়াকাননে যেতে চাও?"

বিমল হেসে বললে, "যদি যাই, তাহ'লে কি হবে রামহরি?"

রামহরি মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, "এবারে ওখানে গেলে তুমি আর প্রাণে বাঁচবে না।"

—"কেন রামহরি, তুমি থাকতে আমাকে প্রাণে মারে কে?"

—"আমি বেঁচে থাকলে তবে তো তোমাকে বাঁচাব? ও বনে ঢুকলে আমরা কেউ আর জ্যান্ত ফিরব না।"

—"ভয় নেই রামহরি, আজ আমরা বনের ভেতরে আর ঢুক্‌ব না। বনের পাশে একটা হ্রদ আছে, আমরা সেইখানেই যাচ্ছি।"

এম্‌নি নানান কথা কইতে কইতে খানিক দূর এগিয়ে যেতেই দেখলুম, হ্রদের জল সূর্য্যের কিরণে ইস্পাতের মতন চক্‌চক্‌ ক'রে উঠছে!

আরো কিছু দূর অগ্রসর হয়েই বুঝলুম, সেই হ্রদের আকার কি বিপুল! তার এপার থেকে ওপারের বিস্তার অন্ততঃ কয়েক মাইলের কম হবে না! তার

জলের ভিতরে মাঝে মাঝে কতকগুলো ছোট-বড় পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এবং সেই পাহাড়-গুলোর উপরে সাদা সাদা পাখীর মতন কি যেন ঘুরে-ফিরে বেড়াচ্ছে আর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে!

তারপর আমরা যখন একেবারে হ্রদের ধারে গিয়ে পড়লুম তখন দেখা গেল, সেগুলো হাঁস ছাড়া আর কিছুই নয়।

বিমল আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "কিন্তু এ কি-রকম হাঁস? এদের একটারও যে ডানা নেই!"

আমি বললুম, "বিমল, এ দ্বীপের কোন জীব দেখেই তুমি আর আশ্চর্য্য হয়ো না। কারণ তোমাকে আগেই বলেছি যে, এ হচ্ছে সেকেলে জীবের রাজ্য!"

—"সেকেলে হাঁসের কি ডানা ছিল না?"

—"না। দরকার হয়-নি ব'লে সেকেলে হাঁসের ডানা গজায় নি। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মই হচ্ছে এই, দরকার না থাকলে কোন কিছুর সৃষ্টি হয় না। বিশেষ, প্রকৃতির পরীক্ষা-কার্য্য তখনো ভালো ক'রে জমে ওঠেনি, কোন্ জীবের কি আবশ্যক আর কি অনাবশ্যক প্রকৃতি তখনো তা নিশ্চিতরূপে বুঝতে পারে নি, তাই সেকেলে জীব-জন্তুদের

দেহে অনেক বাহুল্য, আবার অনেক অভাব আর অপূর্ণতাও থেকে গিয়েছিল। এই, মানুষের কথাই ধর না কেন! সেকেলে মানুষদের মস্তিষ্ক, চোখ, মুখ, নাক, দাঁত, ঘাড়, বুক, হাত, পা—কিছুই একেলে মানুষদের মতন ছিল না,—সেকালে—”

হঠাৎ আমার কথায় বাধা দিয়ে বাঘার গর্জ্জনের সঙ্গে রামহরি চেঁচিয়ে উঠল—“ও কি ও!”

ফিরে দেখি, খানিক তফাতে মহিষের চেয়েও উঁচু একটা জীব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের লক্ষ্য করছে!

আমি ব’লে উঠলুম—“এণ্টেলোডণ্ট্, এণ্টেলোডণ্ট্!”

বিমল বললে, “এণ্টেলোডণ্ট্। সে আবার কি?”

—“সেকেলে দানব-শূকর!”

বিমল তখনি বন্দুক ছুঁড়লে এবং পর-মুহূর্ত্তেই শূকরটা মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল।

আমরা সবাই তার দিকে দৌড়ে গেলুম। কিন্তু শূকরটা মরেনি, আহত হয়েছিল মাত্র। কারণ আমরা তার কাছে যাবার আগেই সে আবার দাঁড়িয়ে উঠে তাড়াতাড়ি সাম্‌নের জঙ্গলের দিকে ছুটল।

সব-আগে বাঘা, তারপর বিমল, তারপর আমি আর রামহরি—এই ভাবে আমরা শূকরটার পিছনে

ছুটতে লাগলুম। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই শূকরটা বনের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রামহরি চেঁচিয়ে বললে, "বনের ভিতরে ঢুকোনা খোকাবাবু, বনের ভেতরে ঢুকোনা!"

কিন্তু বিমলের মাথায় তখন শিকারীর গোঁ চেপেছে—হুঁস্থিদিব্য জ্ঞান হারিয়ে সেই নিবিড় অরণ্যের মধ্যে সে প্রবেশ করল! কাজেই তার পিছনে যাওয়া ছাড়া আমাদেরও আর উপায়ান্তর রইল না।

বন যখন ক্রমে অত্যন্ত ঘন হয়ে উঠল, তখন আমিও বলতে বাধ্য হলুম, "বিমল আর নয়, এইবারে আমাদের ফেরা উচিত!"

বিমল বললে, "এই যে, শূওরের রক্তের দাগ এখনো দেখা যাচ্চে!"

এম্‌নি ক'রে ঘণ্টা-দুয়েক ছুটাছুটির পর রক্তের দাগও আর পাওয়া গেল না! বিমল হতাশ ভাবে একটা গাছের তলায় বসে পড়ল। আমরাও বিষম হাঁপিয়ে পড়েছিলুম, সেইখানেই এক-একটা গাছের গুড়িতে ঠেস দিয়ে বিশ্রাম করতে লাগলুম।

প্রায় আধ ঘণ্টা বিশ্রামের পর আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললুম, "চল, এইবারে ফেরা যাক্!"

বিমল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "কাজেই।"

খানিকদূর অগ্রসর হয়ে বুঝলুম, আমরা ভুল পথ ধ'রে চলেছি। সেদিক থেকে ফিরে এসে আবার অন্য পথ ধরলুম, কিন্তু তবু বন থেকে বেরুবার পথ খুঁজে পেলুম না।

তখন বেলা দুপুর হবে। আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখানে উপরে, নীচে, চার পাশে এমন বিষম জঙ্গল আর গাছপালা যে, দুপুরের সূর্য্যালোকও সে বনের ভিতরে যেন ঢুকতে সাহস করেনি!

আমি দ'মে গিয়ে বললুম, "বিমল, আমরা পথ হারিয়েচি!"

বিমল বললে, 'পথ আমাদের খুঁজে বার করতেই হবে। এইদিকে আসুন।"

বিমলের পিছনে পিছনে আবার চললুম। কিন্তু মিনিট-কয়েক পরেই হঠাৎ চম্‌কে বিমল থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল!

আমি সুধোলুম, "কি হ'ল বিমল, হঠাৎ দাঁড়ালে কেন?"

কোন জবাব না দিয়ে, বিমল সুধু হাত তুলে ইসারায় বললে, "চুপ!"

আমি পা টিপে এগিয়ে গিয়ে যা দেখলুম, তাতে আমার পাদুটো যেন অসাড় হয়ে মাটির ভিতরে ব'সে গেল! তেমন অভাবিত দৃশ্য জীবনে আর কখনো আমি দেখিনি!

পথের পাশেই জঙ্গলের ভিতর থেকে খানিকটা খোলা জমি দেখা যাচ্ছে, সেই জমির ভিতরে দলে দলে ভীষণ-দর্শন জীব বিচরণ করছে—তাদের অধিকাংশই মাথায় প্রায় ষাট-সত্তর ফুট—অর্থাৎ তালগাছের সমান উঁচু।

সেদিন যে কুমীর-কাঙ্গারু আমাদিগকে তাড়া করেছিল, এ জানোয়ারগুলোকে দেখতে প্রায় তারই মতন, তফাৎ খালি এই যে, এগুলো লম্বা-চওড়ায় তার চেয়েও প্রায় দুগুণ বড়!

আমি তাড়াতাড়ি গুণে দেখলুম, দলের ভিতরে প্রায় নব্বইটা জানোয়ার রয়েছে। কোন কোনটা ল্যাজ ও পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে, মস্ত-উঁচু গাছের আগডাল সামনের দুই পা বা হাত দিয়ে ভেঙে নিয়ে চর্ব্বণ করছে! কোন-কোনটা কাঙ্গারুর মত লাফিয়ে এদিকে-ওদিকে যাচ্ছে। আবার কোন কোনটা চুপ ক'রে বসে আছে। কতকগুলো অপেক্ষাকৃত ছোট

জীব পরস্পরের সঙ্গে খেলা করছে—নিশ্চয়ই সেগুলো বাচ্চা। কিন্তু বাচ্চা হ'লেও মাথায় তারা প্রায় হাতীর মতই উঁচু।

আমি চুপি চুপি বললুম, "বিমল, এগুলো ডাইনসর!"

বিমল বললে, "বন থেকে বেরুতে গেলে এদের সুমুখ দিয়ে যেতে হয়। এখন উপায়?"

—"যতক্ষণ না এরা বিদায় হয়, ততক্ষণ আমাদের বনের ভেতরেই ব'সে থাকতে হবে। তা ছাড়া আর কোন উপায় তো দেখি না!"

বাঘা এতক্ষণ ভয়ে বোবা হয়ে পেটের তলায় ল্যাজ গুটিয়ে জীবগুলোকে দেখছিল—হঠাৎ, বনের ভিতর দিকে ফিরে গোঁ গোঁ ক'রে উঠল! আমরাও পিছন ফিরে দেখলুম বনের অন্ধকারের ভিতর থেকে বড় বড় গাছ দুলিয়ে আর-একটা প্রকাণ্ড কি জানোয়ার আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

রামহরি মড়ার মতন ফ্যাকাসে মুখে বললে, "খোকাবাবু, এবারে আর আমাদের রক্ষা নেই!"

সত্যি কথা! বনের ভিতরে আর বাইরে—দুদিকেই সাক্ষাৎ মৃত্যু আমাদের চোখের সামনে বিরাজ করছে,

পালাবার কোন পথই আর খোলা নেই! এবারে বন্দুকের সাহায্যেও আত্মরক্ষা কর্‌তে পারব না, কারণ বন্দুকের শব্দে সমস্ত জীবগুলোই ক্ষেপে গিয়ে একসঙ্গে আমাদের আক্রমণ করতে পারে!

হতাশ হয়ে মরণের অপেক্ষায় আমরা তিনজনে পাথরের মূর্ত্তির মতন দাঁড়িয়ে রইলুম।

এগারো

অরণ্যের বিভীষিকা

বনের ভিতর থেকে যে-শব্দটা আসছিল, হঠাৎ তা থেমে গেল! তারপর খানিকক্ষণ আর কোন সাড়া নেই।

আমরা তখনো তেমনি আড়ষ্ট হয়েই দাঁড়িয়ে রইলুম—প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়ে!

রামহরি হঠাৎ আমার গা টিপলে। তার দিকে ফিরতেই সে বনের উপর-পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করলে!

মাথা তুলে যা দেখলুম, তাতে আমার দেহের রক্ত যেন জল হয়ে গেল!

আমাদের কাছ থেকে মাত্র হাত-পনেরো তফাতেই বনের ফাঁকে একখানা ভয়ঙ্কর বিশ্রী এবং প্রকাণ্ড মুখ জেগে আছে।

আমরা তিনজনেই আস্তে আস্তে সেইখানে গুড়ি মেরে ব'সে পড়লুম।

বিমল চুপি-চুপি বললে, "আবার সেই কুমীর-কাঙ্গারু!"

রামহরি বললে, 'কিন্তু ও আমাদের দিকে তো তাকিয়ে নেই!"

হ্যাঁ, সে তাকিয়ে আছে বনের বাইরের দিকে!

বিমল বললে, "ডাইনসরের দিকে চেয়ে আছে—আমাদের দেখতে পায়-নি।"

ডাইনসরগুলো তখনো নিশ্চিন্ত মনে মাঠের ভিতরে বিচরণ করছিল।

সেই ভীষণ মুখখানা আবার গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল! কিন্তু তার পরেই দেখলুম, তার বিরাট দেহ গুড়ি মেরে জঙ্গলের ভিতর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে!

কী যে তার অভিপ্রায় কিছুই বুঝতে না পেরে মনে মনে আমরা ভগবানকে ডাকতে লাগলুম।

কিন্তু একটু পরেই তার অভিপ্রায় বেশ বুঝা গেল! সে তেমনি সন্তর্পণে বুকে হেঁটে বন থেকে বেরিয়ে মাঠের ভিতরে গিয়ে পড়ল, তারপর ডাইনসরের দলের দিকে আস্তে আস্তে অগ্রসর হ'তে লাগল!

আমি আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললুম, "বিমল,

এখনি আমরা সেকেলে বিয়োগান্ত নাটকের একটা আধুনিক অভিনয় দেখতে পাব! এই কুমীর-কাঙ্গারু যাচ্ছে ঐ ডাইনসরদের আক্রমণ করতে।"

বিমল আশ্চর্য্য স্বরে বললে, "ডাইনসরদের আক্রমণ করতে? কিন্তু কুমীর-কাঙ্গারু পারবে কেন? একে ডাইনসররা আকারে ওর চেয়ে দুগুণ বড়, তার ওপরে গুন্‌তিতেও তারা যে নব্বইটার কম নয়।"

আমি বললুম, "বাঘের চেয়ে ঘোড়া বা জিরাফ তো ঢের বড়, কিন্তু ঘোড়া বা জিরাফের দলে যদি বাঘ পড়ে, তাহ'লে তাদের কি অবস্থা হয় জানো তো? কুমীর-কাঙ্গারু মাংসাশী আর হিংস্র, নিরামিষ-ভক্ত ডাইনসরের চেয়ে আকারে ছোট হ'লেও তার গায়ের জোরও ঢের বেশী!"

রামহরি উৎসাহিত কণ্ঠে বললে, "দেখুন, দেখুন!"

চেয়ে দেখলুম কুমীর-কাঙ্গারুটা তখন ডাইনসরদের খুব কাছে গিয়ে পড়েছে। হঠাৎ ডাইনসররাও তাকে দেখতে পেলে এবং পর-মুহূর্ত্তেই আর্ত্তনাদে সারা বন কাঁপিয়ে লাফাতে লাফাতে বেগে পলায়ন করতে লাগল। কুমীর-কাঙ্গারুও ভীষণ এক গর্জ্জন ক'রে

তাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করলে এবং দেখতে দেখতে একটা ডাইনসরকে ধ'রে ফেললে।

তারপর যে ভয়াবহ দৃশ্যের অভিনয় হ'ল, তা আর বর্ণনীয় নয়! মানুষের চোখ এমন দৃশ্য বোধ হয় আর কখনো দেখে-নি। ডাইনসরটা যদিও আকারে অনেক বড়, তবু কুমীর-কাঙ্গারুটা মস্ত এক লাফ মেরে বিষম বিক্রমে তার গলার তলাটা কামড়ে ধ'রে তাকে মাটির উপরে পেড়ে ফেললে। তাদের গর্জ্জনে ও আর্ত্তনাদে আমাদের কাণ যেন কালা হয়ে গেল, লাঙ্গুল আস্ফালনে এবং লাফালাফির চোটে চারিদিকে রাশি-রাশি ধূলো উড়তে লাগল ও পৃথিবীর বুক থর্-থর্ ক'রে কাঁপতে লাগল, এদিকে-ওদিকে তিন-চারটে প্রকাণ্ড বৃক্ষ মাটির উপরে ভেঙে লুটিয়ে পড়ল! ঘণ্টাখানেক পরে সেই অদ্ভুত যুদ্ধ সমাপ্ত হ'ল। তখন দেখা গেল, ডাইনসরের বিপুল দেহ মাঠের উপরে স্থির হয়ে প'ড়ে আছে এবং কুমীর-কাঙ্গারু পিছনের দুই পা ও ল্যাজের উপর ভর দিয়ে ব'সে হাঁ ক'রে হাঁপাচ্ছে এবং তার মুখের দুই পাশ ও দেহ দিয়ে হু হু ক'রে রক্তের স্রোত ছুটছে! খানিক বিশ্রামের পর মাটির উপরে ল্যাজ আছ্ড়াতে আছ্ড়াতে সে আকাশ-পানে 'মুখ তুলে কয়েকবার

গগনভেদী জয়নাদ করলে, তারপর মৃত ডাইনসরের দেহটা ভক্ষণ করতে প্রবৃত্ত হ'ল। সে এক বীভৎস দৃশ্য এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমাদের ভীত চক্ষের সামনে সেই দৃশ্যের অভিনয় চলল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে গেল, আমরা কিন্তু তখনো বাইরে পা বাড়াতে সাহস করলুম না।

বিমল উদ্বিগ্ন স্বরে বললে, "কি হবে বিনয়বাবু! খাবারের খোঁজে এসে এদিকে অনাহারে প্রাণ যে যায়!"

আমি মনের দুশ্চিন্তা গোপন ক'রে বললুম, "কোনই উপায় নেই। আজকের রাত এই বনের ভেতরই আমাদের কাটাতে হবে। এখন বন থেকে বেরুলেই মৃত্যু!"

রামহরি বললে, "কিন্তু কালও হয় তো আমরা পথ খুঁজে পাব না।"

আমি বললুম, "আমরা এসেচি পূর্ব্বদিকে। কাল সূর্য্য উঠলে পর আমরা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হব। তাহলে আমরা যে পথে এসেচি সে পথ না পেলেও খুব সম্ভব হ্রদের ধারে গিয়ে পড়তে পারব।"

বনের ভিতরে রাত ঘনিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে নানারকম বিভীষিকার সূত্রপাত হ'ল। এতক্ষণ যে বিশাল অরণ্যে কেবল পত্রমর্ম্মর ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যাচ্ছিল না, এখন তার চারিদিকেই নানারকম অদ্ভুত আওয়াজ শোনা যেতে লাগল! নিবিড় অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না; শোনা যাচ্ছে খালি শব্দ! গাছের উপরে শব্দ, জঙ্গলের ভিতরে শব্দ, আমাদের আশেপাশে শব্দ! কোন শব্দ গাছের উপরে ওঠা-নামা করছে, কোন শব্দ চারিদিকে আনাগোনা করছে, কোন শব্দ যেন এক জায়গাতেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ বুঝতে পারলুম, আমাদের খুব কাছ দিয়েই অনেকগুলো অতিকায় জীব আসা-যাওয়া করছে, কারণ তাদের পায়ের চাপে পৃথিবীর মাটি থেকে থেকে কেঁপে উঠছে! সে-সব জীবের আকার যে কত ভয়ানক, ভগবানই তা জানেন! আমরা তিনজনে আতঙ্কে ও ক্ষুধা-তৃষ্ণায় প্রায় মরোমরো হয়ে চুপ ক'রে সেইখানেই বসে রইলুম. জড় পাষাণের মত!

হঠাৎ রামহরি চেঁচিয়ে উঠল এবং পর-মুহূর্ত্তেই কে এক ধাক্কা মেরে আমাকে মাটির উপরে ফেলে দিলে

এবং আমি উঠে বসবার আগেই একটা প্রকাণ্ড ভারি দেহ আমার বুকের উপর চেপে বসল। কে যে আমাকে এমন অতর্কিতে আক্রমণ করলে, অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেলুম না, কিন্তু তার দেহের চাপে আমার দেহের হাড়গুলো যেন ভেঙে যাবার মতন হ'ল। সৌভাগ্যক্রমে বন্দুকটা তখন আমার হাতেই ছিল, কোন রকমে বন্দুকের নলটা আক্রমণকারীর দেহে লাগিয়ে এক হাতেই আমি ঘোড়া টিপে দিলুম, সঙ্গে সঙ্গে বিকট এক আর্ত্তনাদ ক'রে সে জীবটা আমাকে ছেড়ে দিয়ে মাটির উপরে প'ড়ে গেল এবং তার পরেই পায়ের শব্দ শুনে বুঝলুম, সে বেগে পলায়ন করছে!

বিমল ব'লে উঠল, "কি হ'ল, কি হ'ল রামহরি?"

রামহরি বললে, "কে আমার পা মাড়িয়ে দিয়ে গেল!"

আমি উঠে ব'সে বললুম, "কি-একটা জানোয়ার আমার বুকের ওপরে চেপে বসেছিল, কিন্তু আমার বন্দুকের গুলি খেয়ে সে পালিয়ে গেছে!"

বিমল বললে, "কিন্তু এখনি যে বিকট আর্ত্তনাদ শুনলুম, সে তো জানোয়ারের চীৎকার নয়, সে যে মানুষের চীৎকার!"

আমি বললুম, "আমারও তাই মনে হ'ল! কিন্তু বন্দুকের বিদ্যুতের মতন আলোতে আমি এক পলকের জন্যে যে জ্বলন্ত চোখ আর যে ধারালো দাঁতগুলো দেখতে পেয়েচি, তা তো মানুষের নয়! তার গায়ে যে জানোয়ারের মতন বড় বড় লোম ছিল তাও আমি জান্‌তে পেরেচি, কিন্তু আর কিছু জানবার সময় আমি পাইনি—সে জীবটা এসেচে আর পালিয়েচে দুই সেকেণ্ডের মধ্যেই!"

সেই মুহূর্ত্তেই অরণ্যের অন্ধকার ভেদ ক'রে আবার এক তীব্র আর্ত্তস্বর জেগে উঠল! ঠিক যেন কোন মানুষ মর্ম্মভেদী যাতনায় চীৎকার-স্বরে ক্রন্দন করছে!

বারো

অরণ্যের গর্ভে

সেই আর্ত্তনাদ! কিছুতেই আমরা তা ভুলতে পারলুম না, তার প্রতিধ্বনি যেন আরো ভীষণ হয়ে আমাদের বুকের ভিতর ঘুরে বেড়াতে লাগল!

এই সেকেলে জীবের রাজ্যে, অমন মানুষের মতন স্বরে কেঁদে উঠ্‌ল কে? আমি এখানে একলা থাকলে ভাবতুম, এ আমার কাণের ভ্রম। কিন্তু আমাদের তিন জনেরই তো শোনবার ভুল হ'তে পারে না! অথচ এ বনে মানুষ থাকা সম্ভব নয়, কারণ এই দ্বীপের কোথাও আজ পর্য্যন্ত আমরা মানুষের চিহ্নমাত্র দেখতে পাইনি!

অন্ধকারে অবাক হয়ে ব'সে ব'সে অমি ভাবতে লাগলুম—আর ওদিকে বনের মধ্যে তেমনি নানারকম অদ্ভুত শব্দ ক্রমাগত শোনা যেতে লাগল! ভয়ে আমরা কেউ আর কারুর সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত কইতে সাহস

করলুম না—কি জানি, আবার যদি কোন ভয়ানক জীব শুনতে পেয়ে আমাদের আক্রমণ করতে আসে।

বনের ভিতরে সেই সব অজানা শব্দ শুনে আমার মনে হ'তে লাগল যে, অন্ধকারে যেন আমাদের বিরুদ্ধে কারা ষড়যন্ত্র করছে। ধুপ্ ধুপ্, দুম্ দুম্, খস্ খস্, মর্ মর্, সোঁ সোঁ, সর্ সর্! শব্দগুলো যেন চারিদিক থেকে ক্রমাগত বলচে—আমরা তোমাদের হত্যা করব, আমরা তোমাদের হত্যা করব, আমরা তোমাদের হত্যা করব!...নিবিড় অন্ধকারে দেহ ঢেকে চারিদিকে কারা যেন ওঁৎ পেতে ব'সে আছে, তাদের রক্তলোলুপ জ্বলন্ত দৃষ্টি আমরা যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করতে লাগলুম —মাঝে মাঝে কাদের আনাগোনায় পায়ের শব্দ শুনি আর মনে হয়, ঐ ওরা এসে পড়ল—ঐ ওরা এসে পড়ল!...ওঃ, রাত যেন আর পোহাতেই চায় না, আমরা যেন চির-অন্ধকারের কারাগারের মধ্যে আজীবনের জন্যে বন্দী হয়ে আছি আর চারিদিক থেকে সুধু সেই একই শব্দ শোনা যাচ্ছে—আমরা তোমাদের হত্যা করব, আমরা তোমাদের হত্যা করব, আমরা তোমাদের হত্যা করব!

আর একটা মারাত্মক বিপদ থেকে কোন গতিকে

বেঁচে গেলুম, ।······হঠাৎ কার মাটি-কাঁপানো পায়ের শব্দ শুনলুম,তার পরেই মনে হ'ল, একজায়গায় অন্ধকার যেন আরো ঘন হয়ে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। সেই জ্বলন্ত ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে ঠিক বাতাবি লেবুর মত বড় দুটো আগুনের ভাঁটা জ্বল্ জ্বল্ ক'রে জ্বল্‌ছে—মাটি থেকে অনেক—অনেক উঁচুতে! নিশ্চয় সে দুটো কোনো অতিকায় জীবের চোখ! জীবটা যে কোন্ জাতের তা বোঝা গেল না বটে, তবে তার নিঃশ্বাসের হু-হু শব্দ আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারলুম। তার পরেই মড় মড় ক'রে গাছ ভাঙার শব্দ হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই আগুনের ভাঁটা দুটো ও চলন্ত অন্ধকারটা গভীরতর অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেল! রোমাঞ্চিত দেহে একেবারে মাটির সঙ্গে গা মিশিয়ে মড়ার মত স্তব্ধ হয়ে আমরা শুয়ে রইলুম। আর চারিদিক থেকে যেন সেই একই শাসানি শুনতে লাগলুম—হত্যা, হত্যা, আমরা তোমাদের হত্যা করব!··· ···

দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কে আমরা যখন পাগলের মতন হয়ে উঠেছি, পূর্ব্ব-আকাশে তখন উষার ভোরের প্রদীপ ধীরে ধীরে জ্ব'লে উঠ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে অরণ্যের মধ্যে

অন্ধকারের জীবদের আনাগোনার শব্দ আশ্চর্য্যরূপে থেমে গেল! আমরাও আশ্বাস্তির নিঃশ্বাস ফেলে উঠে বসলুম।

বিমল বললে, "কাল যে জীবটা আমাদের আক্রমণ করতে এসেছিল, এই দেখুন তার রক্তের দাগ! এতক্ষণে নিশ্চয় সে ম'রে গেছে। আসুন বিনয়বাবু, এইবারে দেখা যাক্, সেটা কি জীব!"

আমি আপত্তি ক'রে বললুম, "না, না, ক্ষুধা তৃষ্ণা আর পরিশ্রমে আমরা মর'মর' হয়ে পড়েচি, এখন কেবল বন থেকে বেরুবার চেষ্টা করা ছাড়া আর কোনদিকে যাওয়া উচিত নয়—কি জানি, আবার যদি কোন নূতন বিপদে পড়ি!"

বিমল আমার আপত্তি শুন্‌লে না, সে মাটির উপরে শুক্‌নো রক্তের দাগ ধ'রে অগ্রসর হয়ে বললে, "না বিনয়বাবু মানুষের মত কাঁদে কোন্ জীব, সেটা দেখতেই হবে! সে তো আর বেঁচে নেই, তবে আর কিসের ভয়!"

বিমলের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই বনের ভিতরে ভয়ানক এক গর্জ্জন শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে বিমলও থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল।

রামহরি বললে, "এ যে বাঘের ডাক !"

আবার সেই গর্জ্জন— এবারে আরো কাছে ! তার পরেই ভারি ভারি পায়ের শব্দ—যেন মস্তবড় একটা জীব দৌড়ে আস্‌ছে !

আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, "সাবধান বিমল, সাবধান !"

হাতীর মতন প্রকাণ্ড একটা জানোয়ার বনের ভিতর থেকে তীরবেগে বেরিয়ে এল, তার পরেই চোখের নিমিষে পাশের জঙ্গলের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেল ! জীবটা হাতীর মতন বড় বটে, কিন্তু দেখ্‌তে ঠিক ষাঁড়ের মতন !

বিমল আর রামহরির মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন দেখে আমি বললুম, "ও হচ্ছে সেকালের ষাঁড় !"

বিমল বিস্ফারিত চোখে বললে, "হাতীর মতন বড় !"

—"হ্যাঁ। হাজার দুই বছর আগেও রোম্যানরা ঐ-রকম ষাঁড় জার্ম্মান দেশে দেখেছিল।"

রামহরি বললে, "কিন্তু ও-ষাঁড় কি বাঘের মতন ডাকে !"

—"না, বাঘের ডাক শুনেই ষাঁড়টা পালিয়ে গেল। এ বনে সেকেলে বাঘ আছে। সেকেলে বাঘের গায়ে

এখনকার বাঘের মতন দাগ নেই, আকারেও তারা অনেক বড়, আর তাদের মুখের উপর-চোয়ালে ছোরার মতন লম্বা দুটো দাঁত আছে। বিমল, এ বাঘের বিক্রম কি-রকম বুঝচ তো! এত বড় একটা ষাঁড় তার ভয়ে প্রাণপণে পালিয়ে গেল, আমাদেরও এখনি এ বন ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত!”

বিমল বললে, “আপনার কথাই ঠিক! কালকে আমাদের কে আক্রমণ করেছিল, তা আর দেখবার দরকার নেই, এ সর্ব্বনেশে বন থেকে এখন প্রাণ নিয়ে বেরুতে পারলে বাঁচি!”

পূর্ব্বদিকে বনের মাথায় সূর্য্যকে দেখা গেল, প্রদীপ্ত কাঁচা সোনার অপূর্ব্ব মুকুটের মতন! কিন্তু এখানের বনের পাখী তাঁর আবাহন-গান গাইলে না। সূর্য্য স্থধু নিরানন্দ নীরবতার মাঝে পৃথিবীর বুকে সোনার হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

আমরা এসেছি পশ্চিম দিক থেকে, তাই সেই দিকেই যাত্রা সুরু ক'রে দিলুম।

তেরো

নূতন বিপদের সূচনা

ক্ষুধার জন্যে যত না হোক্, তৃষ্ণার তাড়নায় চল্‌তে চল্‌তে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল। জলের অভাব যে কি ভয়ানক অভাব, জীবনে আজ প্রথম তা কল্পনা করতে পারলুম। চল্‌তে চল্‌তে প্রতিপদেই মনে হ'তে লাগল, এই বুঝি দম বন্ধ হয়ে যায়, এই বুঝি মাথা ঘুরে মাটিতে প'ড়ে গেলুম! মাথার মধ্যে যেন আগুনের আংরা জ্বলছে, মুখের ভিতর থেকে জিভটা বাইরে বেরিয়ে আস্‌তে চাইছে, আর মন চাইছে, পথ চলা বন্ধ ক'রে সেইখানেই শুয়ে জীবনের সব লীলা সাঙ্গ করতে।

সেই ভোর থেকে হাঁটছি, আর হাঁটছি, সূর্য্য এখন মাঝ-আকাশে, তবু এই অভিশপ্ত অরণ্য যেন আর আমাদের মুক্তি দিতে চায় না। এ অরণ্য যেন অনন্ত

—এ অরণ্য যেন এক রাত্রের মধ্যে সারা পৃথিবীকে গ্রাস ক'রে ফেলেছে!

রামহরি ঠিক মাতালের মতন টলতে টলতে চলেছে, তার চোখদুটো ঠিক পাগলের মতন হয়ে উঠেছে, আমারও প্রায় সেই অবস্থা।—কিন্তু ধন্য বটে বিমল ছেলেটি, সেও যে ভিতরে ভিতরে আমাদেরই মত কষ্ট পাচ্ছে, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই, কিন্তু তার মুখে চোখে বা ভাবভঙ্গীতে সে-কষ্টের কোন লক্ষণই ফুটে ওঠে নি, ধীর প্রশান্ত ভাবে হাসিমুখে সে আমাদের আগে আগে অগ্রসর হচ্ছে!

শেষটা রামহরি একেবারে হাল ছেড়ে দিয়ে ব'সে পড়ল।

বিমল বললে, "ও কি রামহরি, বসলে কেন?"

রামহরি কাতরভাবে বললে, "খোকাবাবু, জল না খেলে আমি আর চলতে পারব না।"

—"আর একটু পরেই জল পাব, ওঠ রামহরি, ওঠ!"

—"না খোকাবাবু, না,—এ রাজ্যের সব জল শুকিয়ে গেছে, জল আর পাব না। জল না পাই, আমাকে শান্তিতে মরতে দাও। তোমরা চলে যাও, আমার জন্যে ভেব না!"

বিমল আর কিছু বললে না, হেঁট হয়ে রামহরিকে ঠিক শিশুর মতন নিজের কাঁধের উপরে তুলে নিয়ে অনায়াসেই আবার হাঁটতে স্থরু করলে। আমি তো দেখে শুনে অবাক্। বলবান ব'লে আমার নিজের যথেষ্ট খ্যাতি আছে, কিন্তু আজ দুদিনের অনাহার, পথ-শ্রম ও তৃষ্ণার তাড়না সহ্য কর্‌বার পর রামহরির মতন একজন লোককে ঘাড়ে ক'রে পথ চলার শক্তি যে কত খানি বল বিক্রম ও কষ্টসহিষ্ণুতার কাজ, তা বুঝতে পেরে মনে মনে বিমলকে আমি বার বার ধন্যবাদ দিতে লাগলুম।

তারপর যখন নিরাশার চরম সীমায় গিয়ে দাঁড়িয়েছি এবং প্রাণের আশা ছেড়ে আমিও রামহরির মতন শুয়ে পড়ব ব'লে মনে করছি তখন আচম্বিতে বনের ফাঁকে জেগে উঠল, ও কী কল্পনাতীত দৃশ্য!

চোখের সাম্‌নে স্পষ্ট দেখলুম, বিশাল হ্রদের নীল জল অদূরেই টলটল ঢলঢল করছে—সূর্য্যকিরণে বিদ্যুতের মতন চম্‌কে চম্‌কে উঠছে।

কিন্তু এ চোখের ভ্রম নয় তো? সত্যিই কি বন শেষ হয়েছে, আমরা আবার হ্রদের তীরে এসে পড়েছি?

বিমলের হাত ছাড়িয়ে রামহরি মাটির উপরে

লাফিয়ে পড়্ল, তার পর পাগলের মতন চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে হ্রদের দিকে দৌড় দিলে, আমিও তার পিছনে পিছনে ছুটতে লাগলুম—তারই মতন আনন্দে উদ্ভ্রান্ত হয়ে। ...…আমরা তিনজনে মিলে যতক্ষণ পারলুম প্রাণ ভ'রে জল পান করলুম! আহা, সে যে কি তৃপ্তি, কি আনন্দ, কেমন ক'রে তা বর্ণনা করব? শেষটা পেটে যখন আর ধরলো না, তখন আমরা বাধ্য হয়ে ক্ষান্ত হলুম।

রামহরি আহ্লাদে নাচতে নাচতে বললে, "আ, আর আমার কোন কষ্ট নেই, এখন আবার আমি একশো ক্রোশ হাঁটতে পারি!"

আমারও সমস্ত শক্তি আবার ফিরে পেলুম।

বিমল ইতিমধ্যে গোটাকয়েক সেকেলে ডানাহীন হাঁস শিকার ক'রে ফেললে, আমরা সাঁতার দিয়ে তাদের দেহগুলো জল থেকে ডাঙায় এনে তুললুম।

রামহরি মুখ চোক্লাতে চোক্লাতে বললে, "খোকাবাবু, আমার আর দেরি সইবে না, চল, চল, তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে রান্না সুরু করে দিই!"

আমি বল্লুম, "হ্যাঁ বিমল, আমাদের আর দেরি

করা উচিত নয়, কুমার আর কমল এতক্ষণে আমাদের জন্যে ভেবে হয়তো আকুল হয়ে উঠেচে।”

বিমল উঠে দাঁড়িয়ে বললে, “হ্যাঁ, চলুন এইবার। আমরা তো বাসায় প্রায় এসে পড়েচি—ঐ যে আমাদের পাহাড় দেখা যাচ্ছে!”

আমরা সবাই আবার অগ্রসর হলুম। একবার জলপানের পরে আমাদের দেহে আবার নূতন শক্তির সঞ্চার হয়েছিল, তাই এবারে পথ চলতে কোনই কষ্ট হ'ল না। কিন্তু এ দ্বীপে বিপদ দেখ্‌চি পদে পদে! আমরা যখন পাহাড়ের খুব কাছেই এসে পড়েছি মাথার উপরে তখন হঠাৎ শুনতে পেলুম এক বিশ্রী চীৎকার! উপরে চেয়ে দেখি দুটো হাড়-কুৎসিত গরুড়-পাখী চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের দিকে নেমে আসছে!

তাদের উদ্দেশ্য যে ভালো নয়, তা বুঝতে আমাদের কিছুমাত্র বিলম্ব হ'ল না। বিমলের বন্দুক তখনই গর্জ্জন ক'রে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে একটা পাখী গুলি খেয়ে মাটির উপরে এসে পড়ল। পাখীটা সাংঘাতিকরূপে আহত হয়েছিল, কিন্তু সেই অবস্থাতেই করাতের মত দাঁত-ওয়ালা চঞ্চু তুলে সে আমাদের আক্রমণ করতে এল! বিমল বন্দুকের কুঁদো দিয়ে প্রবল এক আঘাতে

তার মাথাটা চূর্ণ ক'রে দিলে! ততক্ষণে আমার বন্দুকের গুলিতে দ্বিতীয় পাখীটারও ভব-লীলা সাঙ্গ হয়ে গেল।

আমরা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই সৃষ্টি-ছাড়া জীব দুটোকে অবাক্ হয়ে দেখতে লাগলুম। বৈজ্ঞানিকেরা যে কি দেখে এদের পাখী ব'লে স্থির করেছেন তা সুধু তাঁরাই জানেন, কারণ পাখীদের সঙ্গে এই বীভৎস জীবগুলোর কিছুই মেলে না, তাদের দেহ পালক-হীন ও সরীসৃপের মতন, দাঁতওয়ালা চঞ্চু আর পা হচ্ছে চারখানা ও লেজ হচ্ছে দড়ির মতন। কিম্ভূত-কিমাকার!

এমন সময় বাঘার চীৎকার শুনলুম—ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ! মুখ তুলে দেখলুম, চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে সে আমাদের দিকেই বেগে ছুটে আসছে।

রামহরি বললে, "ওকি, বাঘা খোঁড়াচ্চে কেন?"

সত্যিই তো, বাঘা ছুটে আসছে বটে, কিন্তু খোঁড়াতে খোঁড়াতে, পিছনের একখানা পা তুলে! তার চীৎকারেও আজ যেন কেমন কাতরতা মাখানো!

বাঘা ছুটে এসে একেবারে আমাদের পায়ের কাছে লুটিয়ে প'ড়ে হাঁপাতে লাগল।

বিমল হেঁট হয়ে প'ড়ে বিস্মিত কণ্ঠে বললে,"বিনয়-বাবু, বিনয়বাবু, দেখুন! বাঘার গায়ে রক্ত!"

হ্যাঁ, বাঘার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত!

বিমল পাহাড়ের দিকে ছুটতে ছুটতে বললে, "শীগ্‌গির আসুন, কুমার আর কমল বোধ হয় কোন বিপদে পড়েচে!"

আমি আর রামহরিও পাহাড়ের দিকে ছুট্ দিলুম।

পাহাড়ের উপরে উঠেও কোন গোলমাল শুনতে পেলুম না। কিন্তু গুহার সামনে গিয়ে দেখলুম, সেখানে পাহাড়ের পাথর রক্তে একেবারে রাঙা হয়ে উঠেছে!

বিমল ঝড়ের মতন গুহার ভিতরে ঢুকে, আবার বেরিয়ে এসে বললে, "গুহার ভিতরে তো কেউ নেই! কুমার, কুমার!"

কেউ সাড়া দিলে না।

আমি চেঁচিয়ে ডাকলুম, "কুমার! কমল!"

কোন সাড়া পেলুম না।

বিমল করুণ স্বরে বললে, "এত রক্ত কিসের বিনয়-বাবু, এত রক্ত কিসের? তবে কি তারা আর বেঁচে নেই?"

আমি বললুম, "হয় তো তারা সমুদ্রের ধারে গিয়েচে। এস, পাহাড় থেকে নেমে খুঁজে দেখি গে!"

সকলে আবার পাহাড় থেকে নেমে গেলুম। কিন্তু নীচে গিয়ে দেখলুম, সমুদ্রের ধারে জনমানব নেই!

বিমল মাথায় হাত দিয়ে সেইখানেই ব'সে পড়ল, রামহরি চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠল, বাঘাও সেই সঙ্গে যোগ দিয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে কাঁদ্‌তে লাগল, কেঁউ, কেঁউ, কেঁউ!

হঠাৎ বালির উপর আমার চোখ পড়ল! তাড়াতাড়ি বিমলকে ডেকে আমি বললুম, "দেখ, দেখ, এ আবার কি ব্যাপার?"

—"কি বিনয়বাবু, কি?"

—"পায়ের দাগ!"

—"পায়ের দাগ! কার পায়ের দাগ?"

—"মানুষের!"

—"তাই তো, একটা দুটো নয়, এ যে অনেক-গুলো। এ আবার কি রহস্য বিনয়বাবু?"

—"বেশ বোঝা যাচ্চে এখানে একদল মানুষ এসেছিল।"

—"কিন্তু আমরা ছাড়া এ দ্বীপে তো আর মানুষ নেই!"

—"নিশ্চয় আছে, নইলে মানুষের পায়ের দাগ এখানে এল কেমন ক'রে? বিমল, কাল রাত্রে আমরা ভুল শুনিনি, বনের ভিতরে কাল নিশ্চয়ই মানুষ আর্ত্তনাদ করেছিল।"

বিমল নিষ্পলক নেত্রে বালির উপরে আঁকা সেই পদচিহ্নগুলোর দিকে তাকিয়ে নির্ব্বাকভাবে দাঁড়িয়ে রইল!

চোদ্দ

চোখের মায়া

এ দ্বীপেও তাহ'লে মানুষ আছে!

কাল রাত্রেই, সেই ভয়ানক বনের নিবিড় অন্ধকারের ভিতরে ব'সে এই সন্দেহটা প্রথমে আমার মনের ভিতরে জেগে উঠেছিল। তারপর আজকে বালির উপরে এই পায়ের দাগ! এ দাগগুলো যে মানুষেরই পায়ের ছাপ, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই!

এতদিন যে দ্বীপকে জনহীন ব'লে মনে করতুম, আজ সেখানে মানুষ আছে জেনে প্রথমটা আমার মন পুলকিত হয়ে উঠল! কিন্তু তারপরেই মনে হ'ল, এখানে মানুষ থাকলেও তারা কি আমাদের বন্ধু হবে? তারা কি আমাদেরই মতন সভ্য? এই যে কমল আর কুমারের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, এ ব্যাপারের সঙ্গে কি তাদের কোনই সম্বন্ধ নেই?

কুমার আর কমল কোথায় গেল ? বাঘার সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত, গুহার সামনেটা রক্তে ভেসে গেছে, এখানে অজানা মানুষের পায়ের দাগ, এ-সব দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে এখানকার মানুষরা হয় তাদের বন্দী, নয় হত্যা করেছে।

রামহরি আকুল কণ্ঠে বললে, "বাবু, বাবু ! নিশ্চয় কোন রাক্ষুসে জানোয়ার এসে কুমার আর কমল বাবুকে খেয়ে ফেলেচে !"

বিমল এতদূর অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে, সে আর কোন কথাই কইতে পারলে না, দুই হাতে মুখ ঢেকে বালির উপরে সে হেঁট হয়ে ব'সে রইল।

আমি তার হাত ধ'রে নাড়া দিয়ে বললুম, "বিমল, ওঠ, ওঠ !"

বিমল মুখ তুলে হতাশ ভাবে বললে, "উঠে কি করব বিনয়বাবু !"

আমি বললুম, "কুমার আর কমলকে খুঁজতে যেতে হবে যে।"

অশ্রুপূর্ণনেত্রে বিমল বললে, "আর কি তারা বেঁচে আছে ?

আমি বললুম, "আমার বিশ্বাস তারা মরে-নি।

এই বালির ওপরে যাদের পায়ের দাগ রয়েছে, তারাই তাদের ধরে নিয়ে গেছে।"

শুনেই বিমলের হতাশ ভাব চলে গেল! একলাফে দাঁড়িয়ে উঠে সে বললে, "এ কথা তো এতক্ষণ আমার মনে হয়-নি! চলুন তবে! তারা যদি বন্দী হয়ে থাকে তাহ'লে তাদের উদ্ধার করতেই হবে!"

আমি বললুম, "দাঁড়াও বিমল, এতটা ব্যস্ত হলে চলবে কেন? আগে আমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে নি!

বিমল বললে, "বন্ধুরা শত্রুর হাতে, এখন আমরা পেটের ভাবনা ভাবব!"

আমি বললুম, "না ভাবলে তো উপায় নেই ভাই! কাল থেকে অনাহারে আছি, আজ কিছু না খেলে শরীর আমাদের ভার বইতে রাজি হবে কেন? কুমার আর কমলের খোঁজে পথে পথে এখন ক'দিন কাটবে কে বলতে পারে?"

অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে বিমল আমাদের সঙ্গে আবার গুহার ভিতরে ফিরে এল। রামহরি সেকেলে ডানাহীন হাঁসগুলোর পালোক ছাড়িয়ে তাড়াতাড়ি উনুনে আগুন দিলে... ... ...

যেমন-তেমন ক'রে খানিকটা সিদ্ধ মাংস খেয়ে এবং

পথে খাবার জন্যে আরো-খানিকটা মাংস সঙ্গে নিয়ে আমরা তিনজনে যখন আবার বেরিয়ে পড়লুম,—সূর্য্য তখন পশ্চিমে নামতে স্থুরু করেছে।

আমার ইচ্ছা ছিল আজ বিশ্রাম ক'রে কাল ভোর-বেলায় কুমার আর কমলের খোঁজে বেরিয়ে পড়ব। কিন্তু এটুকু দেরিও বিমলের সইল না। অথচ সে একবারও ভেবে দেখলে না যে, ঘণ্টা-কয় পরে রাত হ'লেই আমাদের পথের মধ্যেই নিশ্চেষ্ট হয়ে ব'সে থাকতে হবে—কারণ বেলা থাকতে থাকতে এই অল্প সময়ের মধ্যে, নিশ্চয়ই আমরা কুমার আর কমলের কোন খোঁজই পাব না!

সমুদ্রের তীরে গিয়ে বালির উপরে সেই পদচিহ্নগুলো দেখে আমরা অগ্রসর হ'তে লাগলুম। বাঘা কিছুতেই একলা গুহার ভিতরে থাকতে রাজি হ'ল না, কাজেই তাকেও সঙ্গে নিতে হয়েছে। সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমাদের আগে আগে চলল।

পাহাড় আর সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে বালির উপরে অসংখ্য পায়ের দাগ বরাবর চলে গেছে। দাগগুলো এত স্পষ্ট যে অনুসরণ করতে আমাদের কোনই কষ্ট

হ'ল না। দ্বীপের যেদিকে যাচ্ছি এদিকে আমরা আগে আর কখনো আসিনি, এদিকটায় যতদূর চোখ চ'লে দেখতে পাচ্ছি খালি পাহাড়ের পর পাহাড়! অধিকাংশ পাহাড়ই ছোট ছোট—নব্বই কি একশো ফুটের বেশী উঁচু নয়। সেই সব পাহাড়ের মাঝে মাঝে ছোট-বড় বন-জঙ্গল। চলতে চলতে আমার মনে হ'তে লাগল, দ্বীপের এই অজানা অংশে হয়তো সেকালের আরো কত রকমের ভীষণ জীব বাস করে! আজ রাত্রেই হয়তো তাদের অনেকের সঙ্গে দেখাশুনা হয়ে যাবে, কালকের মত আজ রাত্রেও হয়তো প্রতিমুহূর্ত্তেই চোখের সামনে মৃত্যু এসে মূর্ত্তি ধ'রে দাঁড়াবে! এ সব কথা ভাবতেও মন হাঁপিয়ে উঠতে লাগল—এমন নিত্য নব বিপদের সঙ্গে যুঝে যুঝে বেঁচে থাকাও আমার কাছে যেন মিথ্যা ব'লে মনে হ'ল—না আছে আনন্দ, না আছে শান্তি, না আছে দু'দণ্ড বিশ্রাম,—একে কি আর জীবন বলে? এই তো আমাদের দুজনকে আর দেখতে পাচ্ছি না, আর দেখতে পাব কি না তাও জানি না, এম্নি বিপদের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে একে একে আমাদেরও লীলাখেলা সাঙ্গ হয়ে যাবে—দেশের কেউ আমাদের কথা জান্‌তেও

পারবে না, মরবার সময়ে আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের মুখ পর্য্যন্ত দেখতে পাব না !

ভাবতে ভাবতে পথ চলছি। বিমল আর রামহরির মুখেও কোন কথা নেই, তারাও বোধ হয় আমারই মতন ভাবনা ভাবছে ! ঘণ্টা-দুই পরে সূর্য্য পশ্চিম-আকাশের মেঘের দরজা খুলে অদৃশ্য হয়ে গেল, সমুদ্রের নীলজলের উপরে আসন্ন সন্ধ্যার ছায়া ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

আরো খানিকক্ষণ চলবার পরে আমরা যে-জায়গায় এসে দাঁড়ালুম, তার দুদিকে দুটো পাহাড় আর মাঝখানে অরণ্য। পায়ের দাগ বেঁকে সেই বনের ভিতরে চ'লে গেছে।

আমি বললুম, "বিমল, সাম্‌নেই রাত্রি, এখন এ বনের ভিতরে যাওয়া কি উচিত ?"

বিমল বললে, "না গেলেও তো চল্‌বে না !"

আমি বললুম, "কিন্তু গিয়েও তো কোন লাভ নেই ! অন্ধকারে পায়ের দাগ দেখা যাবে না, আমরা যদি নিজেরাই কালকের মতন আবার পথ হারিয়ে ফেলি, তা হলে কুমার আর কমলকে উদ্ধার কর্‌বে কে ?"

বিমল বললে, "তাহ'লে উপায় ?"

—"আমার মতে আজকের রাতটা এই পাহাড়ের উপরে উঠে কোনরকমে কাটিয়ে দেওয়া উচিত। তারপর কাল ভোরে বনের ভিতরে ঢুকলেই চলবে।"

রামহরিও আমার মতে সায় দিলে।

বিমল একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, "আচ্ছা।"

ঠিক সেই সময়ে বাঘা হঠাৎ গোঁ গোঁ ক'রে গজ্‌রে উঠল। আমি সচমকে চারিদিকে তাকালুম, কিন্তু কোথাও কিছু দেখতে পেলুম না। বাঘার মাথায় একটা চাপড় মেরে আমি বললুম, "চুপ কর্ বাঘা, চুপ কর্!"

সে কিন্তু চুপ করলে না, আরো কয় পা এগিয়ে গিয়ে তেম্‌নি গজ্‌রাতে লাগল!

রামহরি বললে, "বাঘা নিশ্চয় কিছু দেখেচে, ও তো মিথ্যে চ্যাঁচায় না!"

কিন্তু কি দেখেছে বাঘা? এদিকে ওদিকে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ জঙ্গলের এক জায়গায় আমার নজর পড়ল—কারণ সেখানকার গাছপালা অল্প অল্প কাঁপছিল!

দু পা এগিয়েই আমি চম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়লুম, সভয়ে দেখলুম, গাছের পাতার ফাঁকে, অন্ধকারের ভিতর থেকে দুটো ভীষণ চোখ জ্বল্-জ্বল্ করছে! সে

ক্রূর চোখের দৃষ্টি কী নিষ্ঠুর—কী তীব্র—তার মধ্যে লেশমাত্র দয়া-মায়ার ভাব নেই! কে ওখানে গাছের আড়ালে ব'সে অমন লোলুপ নেত্রে আমাদের পানে তাকিয়ে আছে—সে কি জানোয়ার, মানুষ, না পিশাচ?

সে চোখদুটোর মধ্যে কি সাংঘাতিক আকর্ষণ ছিল জানি না, কিন্তু নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমি পায়ে পায়ে তার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলুম। শুনেছি সাপেরা কেবল চোখের চাউনি দিয়ে গাছের ডাল থেকে পাখীদের মাটির উপরে টেনে এনে ফেলে—আমারও সেই অবস্থা হ'ল নাকি?

সেই ভয়ানক চোখের আকর্ষণে আচ্ছন্নের মতন এগিয়ে যাচ্ছি,—হঠাৎ পিছন থেকে বিমল ডাকলে, "বিনয়বাবু, বিনয়বাবু!"

পনেরো

রামহরির মহাদেব-বন্দনা

বিমলের চীৎকারে আমার সাড় হ'ল, আমার চমক ভেঙে গেল, শিউরে উঠে আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম। বুঝতে পারলুম আমি সাক্ষাৎ-মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাচ্ছিলুম।

বিমল তাড়াতাড়ি এসে আমার হাত চেপে ধ'রে বললে, "অমন ক'রে বনের ভেতরে ঢুকছিলেন কেন ?"

—"বনের ভেতরে, গাছের ফাঁকে দুটো ভয়ানক চোখ দেখেচি। তোমরা কি কিছু দেখতে পাওনি ?"

বিমল আশ্চর্য্য স্বরে বললে, "চোখ ! কৈ, কোথায় ?"

—"ঐ যে, ঐখানে !" আঙুল তুলে বিমলকে জায়গাটা দেখিয়ে দিতে গিয়ে দেখি, সেই নিষ্ঠুর চোখ-দুটো আর সেখানে নেই ! কিন্তু বাঘা তখনো জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করছিল !

—"বিমল, চোখদুটো ওখান থেকে সরে গেছে !"

—"আচ্ছা, আমি জঙ্গলের ভেতরটা একবার দেখে আসি।" ব'লেই বিমল অগ্রসর হ'ল, কিন্তু রামহরি তাড়াতাড়ি বিমলের পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়ে বললে, "না না, সে কিছুতেই হবে না! জঙ্গলের ভেতরে নিশ্চয়ই ভূত আছে!"

বিমল বললে, "ভূত কি তোমার ঘাড় থেকে কখনো নামবে না, রামহরি? পথ ছাড়ো, আমাকে দেখতে দাও!"

আমি বললুম, "বিমল, এই ভর্‌সন্ধ্যেবেলায় তুমি আর গোঁয়ার্ত্তুমি কোরো না! জঙ্গলের ভেতরে কি আছে, আজ আর তা দেখবার দরকার নেই। এস, এইবেলা আলো থাকতে থাকতে পাহাড়ের উপরে উঠে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করি।"

অগত্যা বিমলকে আমার প্রস্তাবে রাজি হ'তে হ'ল। আমরা সকলে পাহাড়ে চড়তে সুরু করলুম। পাহাড়টা বেশী উঁচু নয়, তার মাথায় উঠতে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না। উপরে গিয়ে একটা জায়গায় শ্রান্ত দেহে আমরা ব'সে পড়লুম।

পৃথিবীর বুকের উপরে সন্ধ্যা তখন তার আঁধার-অঞ্চল ধীরে ধীরে বিছিয়ে দিতে সুরু করেছে—অদূরে

সমুদ্রের নীল রং ছায়ার মায়ায় ক্রমেই ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসছে। আকাশ এখানে ঠিক আমাদের দেশের মতই সুন্দর—এই দ্বীপের কোন বিভীষিকার আভাস তার নীলিমাকে ম্লান ক'রে দেয়নি। তবে বাংলাদেশে সন্ধ্যার সাড়া পেয়ে বকের দল যেমন নীলসায়রে শ্বেত পদ্মের মালার মতন দুলতে দুলতে ভেসে যায়, সে ছবি এখানে কেউ দেখতে পায় না।

পাহাড়ের পাশের বনের দিকে তাকিয়ে একটি নূতনত্ব চোখে পড়ল ; এই বনে যেমন বড় বড় গাছ আছে, দ্বীপের আর কোথাও তা নেই। অনেক গাছ আমাদের পাহাড়েরও মাথা ছাড়িয়ে চারিদিকে ডাল-পাতা বিস্তার ক'রে শূন্যের দিকে উঠে গেছে,—গাছ যে এত উঁচু হ'তে পারে আগে আমার সে ধারণা ছিল না! এ-সব গাছের নাম বা জাতও আমার জানা নেই।......

রাতটা নিরাপদেই কেটে গেল, জলাভাব ছাড়া আর কোন কষ্ট আমাদের ভোগ করতে হ'ল না।

সকালবেলায় পূর্ব্বাকাশের নীলমুখ সবে যখন রাঙা হয়ে উঠেচে আমরা তখন পাহাড় থেকে আবার নীচে নেমে এসে দাঁড়ালুম।

কাল যে-জঙ্গলের ভিতরে সেই চোখদুটো

দেখেছিলুম, আগেই বাঘা তার কাছে ছুটে গেল। তারপর জঙ্গলের আশপাশ খুব সন্তর্পণে গলা বাড়িয়ে দেখে এবং ভালো ক'রে শুঁকে আবার সে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে আমাদের কাছে শান্ত ভাবে ফিরে এল—বাঘার হাবভাব দেখেই আমরা বুঝতে পারলুম যে, জঙ্গলের ভিতরে আজ আর কোন শত্রু লুকিয়ে নেই।

আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আমরা সেই দুই পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলুম। সে অরণ্য গভীর বটে কিন্তু খুব নিবিড় নয়। তার উপরে দু-ধারের বড় বড় গাছের মাঝখান দিয়ে সুন্দর একটি পায়ে-চলা পথের রেখা এঁকে বেঁকে বরাবর চলে গেছে। কারা এই বনের ভিতরে এমন পথের সৃষ্টি করেছে? নিয়মিত ভাবে আনাগোনা না করলে এমন পথ কখনো তৈরি হ'তে পারে না, কিন্তু কারা এখান দিয়ে আনাগোনা করে? আমাদের মনের ভিতরে কেবলই এই প্রশ্ন উঠতে লাগল, কিন্তু এ বিচিত্র রহস্যের কোনই কিনারা ক'রে উঠতে পারলুম না।

সেই পথ ধরেই অগ্রসর হ'তে লাগলুম। চারিদিকে গাছপালা আর বন-জঙ্গল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—

মাঝে মাঝে অল্প হাওয়ায় ভোরের আলোতে চিকণ গাছের পাতাগুলো অস্ফুট আর্ত্তনাদের মতন অস্পষ্ট আওয়াজ ক'রে কেঁপে কেঁপে উঠছে মাত্র, তা ছাড়া আর কোন দিকেই কোন জীবনের লক্ষণ নেই! এ নিস্তব্ধতা কেমন যেন অস্বাভাবিক! বনের আশেপাশে রোদের সোনালী আভা দেখে আমার মনে হ'তে লাগল, গভীর রাত্রির নীরবতার মাঝখানে সে যেন চোরের মতন চুপিচুপি ঢুকে পড়েছে! তার উপর আর এক অসোয়াস্তি! সেই অতিকায় সেকেলে জীবের অরণ্যের মধ্যে ঢুকে আমাদের মনে যে অমানুষিক বিভীষিকার ভাব জেগে উঠেছিল, এখানেও বুকের ভিতরে তেমনি একটা আতঙ্কের আভাস জাগতে লাগল! কে যেন লুকিয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসছে, কারা যেন আড়াল থেকে আমাদের সর্ব্বাঙ্গে ক্ষুধিত চোখের চাউনি বুলিয়ে দিচ্ছে! সাম্‌নে পিছনে, ডাইনে বাঁয়ে, উপরে নীচে—সব দিকেই তাকিয়ে দেখি, কিন্তু জন-প্রাণীকেও দেখতে পাই না,—অথচ ভয় যায় না, গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, থেকে থেকে চমকে দাঁড়িয়ে পড়ি। এ যে আমাদের মনের মিথ্যে ভ্রম তাও তো বলতে পারি না, কারণ অবোধ পশু বাঘা,

সেও চলতে চলতে হঠাৎ স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছে, কাণ পেতে কি যেন শুনছে আর মাঝে মাঝে গোঁ গোঁ ক'রে গজ্‌রে উঠেছে! স্পষ্ট দিনের আলোতেও যে এমন একটা অজানা আতঙ্ক মানুষের মনকে আচ্ছন্ন ক'রে দিতে পারে, আগে আমার সে বিশ্বাস মোটেই ছিল না!

এম্‌নি ভয়ে-ভয়ে প্রায় ক্রোশখানেক পথ পার হয়ে একটা খোলা মাঠের ধারে এসে পড়লুম। সাম্‌নে থেকে গাছপালার সবুজ পর্দ্দা স'রে গিয়ে দেখা দিলে এক অপূর্ব্ব, কল্পনাতীত দৃশ্য।

মাঠের একপাশে আবার এক বিশাল হ্রদ—প্রভাত-সূর্য্যের মায়া-কিরণে তার অগাধ জলরাশি তরলিত মণিমাণিক্যের মতন বিচিত্র হয়ে উঠেছে। হ্রদের মাঝ-খানে ঠিক যেন ছবিতে-আঁকা, তরু-লতা-দিয়ে ঢাকা ছোট্ট একটি ছায়া-মাখা দ্বীপ এবং সেই দ্বীপের শ্যামলতা ভেদ ক'রে মাথা তুলে জেগে আছে পিরামিডের মতন একটি পাহাড়! সবচেয়ে অবাক ব্যাপার এই যে, পাহাড়ের বুকের ভিতর থেকে মাঝে মাঝে অসংখ্য আগুনের লক্‌লকে শিখা হু হু ক'রে বাইরে বেরিয়ে আসছে—ঠিক যেন রাশি রাশি

অগ্নিময় সর্প মহাক্রোধে কোন্ এক অদৃশ্য শত্রুকে থেকে থেকে ছোবল মেরে আবার গর্ত্তের ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। হ্রদের জলে সেই অগ্নি-লীলার ছায়া প'ড়ে দৃশ্যটাকে আরও চমকপ্রদ ক'রে তুলেছে!

আমরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম—এমন অদ্ভুত দৃশ্য আর কখনো চোখে দেখিনি—এ দৃশ্য যেমন আশ্চর্য্য, তেমনি সুন্দর, তেমনি গম্ভীর!

রামহরি হঠাৎ সেইখানে শুয়ে পড়ে দণ্ডবৎ হয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করলে!

আমি বললুম, "ওকি রামহরি, প্রণাম করলে কাকে?"

রামহরি উঠে ব'সে বললে, "আজ্ঞে, দেবতাকে!"

—"দেবতা! কোথায় দেবতা?"

সম্ভ্রমের সঙ্গে পাহাড়ের দিকে আঙুল তুলে রামহরি বললে, "ঐ যে, দেবতা ঐখানে আছেন!"

আমি হেসে ফেলে বললুম, "ওটা তো আগ্নেয়-গিরি! তোমার প্রণামটা যে বাজে খরচ হ'ল রামহরি!"

কিন্তু রামহরি আমার কথায় বিশ্বাস করলে না। তাড়াতাড়ি জিভ কেটে বললে, "ছি ছি, অমন কথা

বলবেন না বাবু! ইংজিরি কেতাব পড়ে আপনারা সব ক্রিশ্চান হয়ে গেছেন, দেবতা-টেবতা মানেন না, সেই পাপেই তো এত বিপদে পড়চেন! ওখানে মহাদেব আছেন, ও আগুন যে তাঁরই চোখের আগুন—ঐ আগুনেই তো মদন ভস্ম হয়েছিল! হে বাবা মহাদেব, তুমি আমার বাবুদের অপরাধ নিও না বাবা।" ব'লে আবার সে মাটির উপরে ভক্তিভরে কপাল ঠুকতে লাগল।

বিমলের কিন্তু এ-সব কিছুই ভালো লাগছিল না, সে অস্থির ভাবে বারকয়েক এদিকে-ওদিকে ঘোরাঘুরি ক'রে আমার কাছে এসে বললে, "এখনো তো কুমার আর কমলের কোনই খোঁজ পাওয়া গেল না।"

আমি বললুম, "না। কিন্তু আমার বিশ্বাস, তারা এই বনের ভেতরেই আছে।"

বিমল নিরাশ কণ্ঠে বললে, "আমার বিশ্বাস, তারা আর বেঁচে নেই। বিনয়বাবু, তাদের এই অকাল মৃত্যুর জন্যে আমরাই দায়ী। গুহার ভেতরে নিরস্ত্র অবস্থায় তাদের যদি ফেলে না রেখে যেতুম, তা'হলে কখনোই এমন দুর্ঘটনা ঘটত না—"

আচম্বিতে বাঘা চেঁচিয়ে উঠল, আমি চোখের পলকে

ফিরে দাঁড়ালুম! ও আবার কি দৃশ্য? প্রকাণ্ড এক গাছের তলায় সারি সারি ওরা কারা এসে দাঁড়িয়েছে? মানুষের মত তারা দাঁড়িয়ে আছে, মানুষের মতন তাদের হাত-পা-দেহ—কিন্তু তারা মানুষ নয়! যাদুঘরে আমি গরিলার মূর্ত্তি দেখেছি, এদেরও দেখতে অনেকটা সেই রকম, কিন্তু এরা গরিলাও নয়! এদের রং কালো, গায়ে বড় বড় লোম, হাতগুলো এত লম্বা যে প্রায় হাঁটুর কাছে এসে পড়েছে! দেহের তুলনায় এদের মাথাগুলো ছোট ছোট, মুখ-শ্রী প্রায় মানুষের মতন বটে, কিন্তু ভয়ানক কুৎসিত, নাক চ্যাপ্টা, আর মুখের আধখানা দাড়ী-গোঁফে ঢাকা! এদের চেহারা মানুষ আর বন-মানুষের মাঝামাঝি! পণ্ডিতেরা যে বানর-মানুষের কথা লিখেছেন, তবে কি এরা তাই?

পাশের আর-একটা গাছের ডাল-পাতার ভিতর থেকে ঝুপ্ ঝুপ্ ক'রে আরো অনেকগুলো বানর-মানুষ পৃথিবীর উপরে অবতীর্ণ হ'ল—প্রত্যেকেরই হাতে এক একগাছা মোটা লাঠি! তারপর আর একটা গাছ থেকে আরো কতকগুলো জীব মাটির উপরে এসে দাঁড়াল —এমনি ক'রে তারা ক্রমেই দলে ভারি হয়ে উঠতে লাগল!

আমি বললুম, "বিমল, এরাই হচ্ছে মানুষের পূর্ব্ব-পুরুষ। কিন্তু এরা বোধ হয় আমাদের আক্রমণ করতে চায়।"

বিমল কোন জবাব না দিয়ে বন্দুকটা কাঁধের উপর থেকে নামিয়ে, বেশ ক'রে বাগিয়ে ধরলে।

ষোলো

অতিকায় পথ

এই বানর-মানুষরা যে আমাদের আক্রমণ করতে চায়, সে বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ রইল না। কারণ ক্রমে ক্রমে দলে ভারি হ'য়ে তারা আমাদের একেবারে ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করলে! তারা নানান রকম অঙ্গভঙ্গী ও চীৎকার ক'রে কি-সব বলতে লাগল, সেগুলো অর্থহীন শব্দ, অথবা তাদের ভাষা, তাও বুঝতে পারলুম না!

আমি বললুম, "বিমল, যদি বাঁচতে চাও, দৌড়ে ঐ হ্রদের ধারে চল! নইলে এরা আমাদের একেবারে ঘিরে ফেললে আর বাঁচবার উপায় থাকবে না!"

বিমল বললে, "হুঁ!"

কিন্তু বানর-মানুষরাও বোধ হয় আমাদের উদ্দেশ্য বুঝে ফেললে! কারণ আমরা হ্রদের দিকে ফিরতে না

ফির্‌তেই ভয়ানক চীৎকারে আকাশ কাঁপিয়ে তারা আমাদের আক্রমণ করলে!

সঙ্গে সঙ্গে বিমলও কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না ক'রে বন্দুক ছুঁড়লে, আমিও আমার বন্দুকের ঘোড়া টিপলুম—অব্যর্থ লক্ষ্যে দুটো জীব তৎক্ষণাৎ মাটির উপরে হাত-পা ছড়িয়ে আছ্‌ড়ে প'ড়ে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল!

বন্দুকের গর্জ্জনে আর সঙ্গী দুজনের অবস্থা দেখে বাকি বানর-মানুষগুলো হতভম্ব ও মূর্ত্তির মতন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল! জীবনে তারা আগ্নেয় অস্ত্র কখনো তো চোখে দেখেনি, কোন্ মায়ামন্ত্রে আমরা যে তাদের দুই সঙ্গীর অমন দুরবস্থা করলুম এটা বুঝতে না পেরে ভয়ে ও বিস্ময়ে নিশ্চয় তারা অবাক হয়ে গেল।

সেই ফাঁকে আমরা হ্রদের দিকে ছুট দিলুম। ...... প্রায় যখন জলের কাছাকাছি এসে পড়েছি, তখন আবার আর এক বিপদ।......হ্রদের উপরে কয়েক খানা ছিপের মতন লম্বা নৌকো ভাসছে এবং প্রত্যেক নৌকোর মধ্যে মানুষের মতন দেখতে অনেকগুলো ক'রে লোক!

নৌকাগুলো বেগে তীরের—অর্থাৎ আমাদের—দিকে ছুটে আসছে। নিশ্চয় আরো একদল বানর-মানুষ জলপথ আগ্‌লে আছে। ভেবেছিলুম সাঁৎরে হ্রদের ঐ দ্বীপে গিয়ে উঠে প্রাণ বাঁচাব, কিন্তু এখন দেখছি সে পথও বন্ধ!

পিছনে ফিরে দেখি, মাঠের উপরের বানর-মানুষদের দল আরো-পুরু হয়ে উঠেছে। আহত সঙ্গী দুজনের চারপাশ ঘিরে তাদের অনেকে উত্তেজিত ভাবে অঙ্গভঙ্গী কর্‌ছে,—অনেকে আবার আমাদের লক্ষ্য ক'রে বিকট স্বরে চীৎকার ও লাঠি আস্ফালন করতেও ছাড়ছে না।

আমাদের তরফ থেকে বাঘাও লাঙ্গুল আস্ফালন ক'রে তাদের চীৎকারের উত্তর দিতে লাগল!

রামহরি বললে, "বাবু, এখন আমরা কোন্ দিকে যাই?"

বিমল বললে, "আবার বনের ভেতর চল। সেখানে হয়তো লুকোবার একটা জায়গা পাওয়া যেতে পারে।"

তা ছাড়া আর উপায়ও নেই। বিশেষ, বনের ভিতরে আত্মরক্ষারও সুবিধা বেশী। বন খুব কাছেই ছিল, আমরা আবার ছুটে তার মধ্যে গিয়ে ঢুকলুম—

মাঠ ও নৌকো থেকে শত্রুরা উচ্চস্বরে চীৎকার ক'রে উঠল।

একটা কোন গোপন স্থান খোঁজবার জন্যে আমরা বনের চারিদিকে ছুটাছুটি করতে লাগলুম। কিন্তু সেখানে আবার এক নূতন আতঙ্ক! লুকোবার ঠাঁই খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ বনের এক জায়গায় দেখি, দোতালা বাড়ীর চেয়েও উঁচু একটা অতিকায় ভীষণ জানোয়ার দুই পা ছড়িয়ে ব'সে আছে এবং দুই হাত বাড়িয়ে মস্ত একটা গাছ অতি অনায়াসে মড়্ মড়্ ক'রে ভেঙে ফেলছে। দেখতে তাকে অনেকটা ভাল্লুক ও বনমানুষের মাঝামাঝি।

বিস্ময়-স্তম্ভিত নেত্রে বিমল বললে, "ওকি সর্ব্বনেশে জন্তু?"

আমি বললুম, "অতিকায় শ্লথ্!"

—"ও যদি আমাদের দেখতে পায়, তাহ'লে যে আর রক্ষে থাকবে না!"

—"এর চেয়ে যে বানর-মানুষদের সঙ্গে লড়াই করা ভালো! এস, এস, পালিয়ে এস!"

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আবার বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলুম।

রামহরি বললে, "যে দিকে চাই সেই দিকেই বিপদ, এবারে সত্যিই বুঝি প্রাণটা গেল!"

বিমল হেসে বললে, "কই রামহরি, তোমার মহাদেবকে আর ডাকচ না কেন? আর একবার ডেকে দেখ, যদি তিনি এ বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার করতে পারেন!"

রামহরি রেগে বললে, "মরতে বসেচ খোকা-বাবু, এখনো দেব্‌তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা। হে বাবা মহাদেব! খোকাবাবু ছেলেমানুষ, তার অপরাধ ক্ষমা কর"— ব'লেই হাত জোড় ক'রে কপালে ছোঁয়ালে।

বিমল বললে, "কিন্তু কি আশ্চর্য্য, বানর-মানুষ গুলো অবাক হয়ে কি দেখচে? ওরা যে এখনো আমাদের আর আক্রমণ করলে না? ওরা কি আমাদের বন্দুকের ভয়েই আর এগুচ্চে না?"

আমি বললুম, "ওরা সবাই হ্রদের নৌকোগুলোর দিকেই তাকিয়ে আছে। বোধ হয় ওরা নৌকোগুলো ডাঙায় আসার জন্যে অপেক্ষা করচে। নৌকো ডাঙায় এলেই ওরা একসঙ্গে দুই দিক থেকে আমাদের আক্রমণ করবে!"

বিমল বললে, "নৌকোর ওপরেও গুলি চালাব নাকি?"

—"না, নৌকোগুলো এখনো দূরে আছে, বন্দুক ছুঁড়লে হয়তো ফল হবে না। বন্দুক যদি ছুঁড়তে হয় তো মাঠের দিকেই ছোঁড়ো, আরো দু-একজন মরলে বাকি বানর-মানুষগুলো ভয়ে পালিয়ে যেতে পারে!"

—"তাই ভালো।"

আমরা দুজনেই শত্রুদের লক্ষ্য ক'রে বার কয়েক বন্দুক ছুঁড়লুম। যা ভেবেছি তাই! বন্দুকের মারাত্মক শক্তি দেখে অনেকগুলো বানর-মানুষ লাফ মেরে আবার গাছের উপরে উঠে ঘন পাতার আড়ালে অদৃশ্য হ'য়ে গেল, অনেকে বনের ভিতরে ঢুকে পড়ল, মাঠের উপরে রইল খালি পাঁচ-ছয়টা আহত বা মৃত দেহ! কিন্তু শত্রুদের ঘন ঘন চীৎকার শুনেই বুঝলুম, তারা আমাদের আশা একেবারে ত্যাগ ক'রে পালিয়ে যায়নি —আড়ালে আড়ালে ওৎ পেতে বসে আছে।

হ্রদের দিকে তাকিয়ে বিমল বললে, "এইবারে এদের ব্যবস্থা করতে হবে।"

—"কিন্তু বিমল, নৌকোর ওপরে ওরা কারা রয়েচে? ওদের তো বানর-মানুষ ব'লে মনে হচ্ছে না!"

—"হ্যাঁ, তাইতো! ওরা তো বানর-মানুষদের মতন ল্যাংটো নয়—ওদের পরোণে জামা-কাপড়ের মতন কি যেন রয়েচে না?"

—"হ্যাঁ।—বোধ হয় ওরা আমাদেরই মতন মানুষ!"

—"সংখ্যায় তো দেখচি ওরা চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের কম নয়! তাহ'লে এখানে আমরা ছাড়া আরো মানুষ আছে! কিন্তু কি মৎলোবে ওরা আমাদের কাছে আসচে? ওরা শত্রু না মিত্র?"

—"কিছুই তো বুঝতে পারচি না! হয়তো ওরা অসভ্য মানুষ, হ্রদের ঐ দ্বীপে থাকে।"

নৌকোগুলো ডাঙার খুব কাছে এসে পড়ল। একখানা নৌকোর উপরে হঠাৎ দুজন লোক দাঁড়িয়ে উঠল এবং দুহাত তুলে চীৎকার ক'রে ডাকলে—"বিমল! রামহরি! বিনয়বাবু! বাঘা!"

শুনেই বাঘা তীরের মত হ্রদের দিকে ছুটে গেল! আনন্দে আমাদেরও বুক যেন নেচে উঠল—এ যে কুমার আর কমলের গলা!

আমরাও এক দৌড়ে হ্রদের ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম—সঙ্গে সঙ্গে একখানা নৌকো থেকে কুমার আর কমল

ডাঙায় লাফিয়ে পড়ল এবং বাকি নৌকোগুলো থেকেও উল্লসিত কণ্ঠে উচ্চ চীৎকার শুনলুম—"বিনয়বাবু, বিনয়বাবু!"

আনন্দের প্রথম আবেগ সাম্‌লে দেখি, আমাদের চারপাশে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে যারা, তারা কেউই অচেনা লোক নয়! তারা হচ্ছে আমাদেরই দেশের লোক, মঙ্গল-গ্রহের বামনরা বিলাসপুর থেকে তাদের বন্দী ক'রে নিয়ে গিয়েছিল এবং এই দ্বীপে এসেই তাদের সঙ্গে আমাদের প্রথম ছাড়াছাড়ি হয়। পাঠকরা নিশ্চয়ই তাদের কথা ভুলে যান নি।

মনের আনন্দে আমরা যখন কথাবার্ত্তায় বিভোর হয়ে আছি, আচম্বিতে মাঠের দিক থেকে বিষম একটা গোলমাল শোনা গেল। ফিরে দেখি, বনের নানাদিক থেকে পিল-পিল ক'রে দলে দলে বানর-মানুষ বেরিয়ে আসছে! দেখতে-দেখতে হাজার-হাজার বানর-মানুষে মাঠের একদিক একেবারে ভ'রে গেল। হঠাৎ ভীষণ হল্লা ক'রে তারা একসঙ্গে আবার আমাদের আক্রমণ করতে অগ্রসর হ'ল।

বিমলও আবার বন্দুক তুলে ফিরে দাঁড়াল।

কুমার বললে, "মিছে গোলমাল বাড়িয়ে লাভ নেই

বিমল! এস, আমরা নৌকোয় গিয়ে চড়িগে! ওরা সাঁতার জানে না, জলকে বড় ভয় করে!"

আমি সায় দিয়ে বললুম, "হ্যাঁ, সেই কথাই ভালো। ওদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে যদি আমাদের কেউ মারা পড়ে, তাহলে আজকের এই মিলনের আনন্দ অনেকখানি ম্লান হয়ে যাবে।"

আমরা সকলে মিলে তাড়াতাড়ি নৌকোর উপরে গিয়ে উঠে বসলুম। বানর-মানুষরা যখন হ্রদের ধারে এসে দাঁড়াল, আমাদের নৌকোগুলো তখন তাদের নাগালের বাইরে গিয়ে পড়েছে। নিস্ফল আক্রোশে আমাদের লক্ষ্য ক'রে তারা কতকগুলো বড় বড় পাথর বৃষ্টি করলে, কিন্তু সেগুলো আমাদের কাছ পর্য্যন্ত এসে পৌঁছলো না। উত্তরে আমরাও বন্দুক ছুঁড়লে বানর-মানুষদের আরো কিছু শিক্ষা হ'ত বটে, কিন্তু আমাদের আর বন্দুকের টোটা নষ্ট করতে প্রবৃত্তি হ'ল না।

নৌকোগুলো হ্রদের সেই দ্বীপের দিকে ভেসে চলল।

আমি বললুম, "কুমার, তোমরা কি ক'রে এখানে এলে সে কথা তো কিছুই বললে না?"

কুমার বললে, "আচ্ছা শুনুন, খুব সংক্ষেপে বলে যাচ্ছি।...আপনারা যেদিন শিকারের খোঁজে বেরিয়ে গেলেন, সেইদিন রাত্রেই ঐ বনমানুষগুলো আমাদের আক্রমণ করে। ওরা যে কি ক'রে আমাদের খোঁজ পেলে তা আমি জানি না। তাদের সেই হঠাৎ আক্রমণে আমরা একেবারে কাবু হয়ে পড়লুম। লাঠির ঘায়ে আমার মাথা ফেটে গেল, বাঘাও রীতিমত জখম হ'ল। তারপরে তারা আমাকে আর কমলকে নিয়ে নিজেদের বাসায় ফিরে এল। আমাদের নিয়ে ওরা যে কি করত তাও বলতে পারি না। তবে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় একদিন আমরা একটা গাছতলায় প'ড়ে রইলুম। বনমানুষগুলো বড় বড় গাছের উপরে লতা-পাতা ডাল দিয়ে ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর বানিয়ে বাস করে। দ্বিতীয় দিন রাত্রে যখন তারা গাছের উপরে ঘুমে অচেতন, আমি তখন কোনরকমে পকেট থেকে আমার ছুরিখানা বার করলুম। তারপর ছুরিখানা দাঁতে চেপে ধ'রে আগে কমলের বাঁধন কেটে দিলুম, তারপর কমল আমাকে মুক্ত করলে। শত্রুরা টের পাবার আগেই আমরা পালিয়ে এই হ্রদের ধারে এসে উপস্থিত হলুম, তারপর সাঁতার দিয়ে একেবারে ঐ

দ্বীপে গিয়ে উঠলুম। ওখানে এই পুরাণো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা!”

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, “কিন্তু ওরা কি ক’রে ওখানে এল ?”

কুমার বললে, “সে অনেক কথা। দ্বীপে গিয়ে শুনবেন। আজ বন্দুকের আওয়াজ শুনেই আমরা বুঝতে পেরেছিলুম যে, আমাদের খোঁজে আপনারা এখানে এসেচেন!”

কে যেন আকাশের নীলিমাকে নিংড়ে হ্রদের জলে গুলে দিয়েছে,—কী স্বচ্ছ নীল তার রং! তার তলা পর্য্যন্ত সূর্য্যদেবের কিরণ-প্রদীপ জ্বল্ জ্বল্ ক’রে জ্বলছে এবং কত রকমের মাছ যে সেখানে খেলা ক’রে বেড়াচ্ছে, তাও স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে!

আগ্নেয় গিরির আগুন-জিভগুলো এখন আমাদের চোখের খুব কাছেই লক্ লক্ ক’রে উঠছে এবং গাছের পর গাছের সবুজ আঁচলে-ঢাকা সেই ছায়া-নাচানো দ্বীপটিও একেবারে আমাদের কোলের সামনে এসে পড়েছে!……তার পরেই আমাদের নৌকোগুলো একে একে তীরে গিয়ে ভিড়ল।

দ্বীপে যে লোকগুলি আশ্রয় নিয়েছে তাদের সর্দ্দার

ছিল সোনাউল্লা। দ্বীপে নেমে আমাকে সেলাম ঠুকে সে বললে, "বাবুজী, আজ আগেই আপনাদের খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে তো?"

—"হাঁ। সোনাউল্লা, তাহ'লে বড় ভালো হয়—আমাদের ভারি ক্ষিদে পেয়েচে। তুমি তাড়াতাড়ি যাহোক কিছু রেঁধে আমাদের খাইয়ে দাও!"

—"কিন্তু বাবুজী, আমরা যে মুসলমান!"

—"ভাই সোনাউল্লা, আমরা এখন ভগবানের নিজের রাজত্বে বাস করচি……হয়তো এইখানেই আমাদের চিরকাল বাস করতে হবে। এখানে কেউ হিন্দুও নয়, কেউ মুসলমানও নয়—এখানে স্ুধু এক জাত আছে, সে হচ্ছে মানুষ-জাত। দলাদলিতে মানুষ যে-সব জাতের স্বৃষ্টি করেচে এখানে আমরা তা মানব না। তুমি যাও সোনাউল্লা, আগে তোমার হাতের রান্না খেয়ে পেট ঠাণ্ডা করি, তারপর তোমাদের কাহিনী শুনব।"

সতেরো

খাঁড়া-দেঁতো বাঘ

আহারাদির পর একটা গাছতলায় পা ছড়িয়ে ব'সে সোনাউল্লার কাহিনী শুনতে লাগলুম :—

"বাবুজী, বামনদের উড়োজাহাজ যেদিন আবার পৃথিবীতে এসে নামল, আমাদের আর আনন্দের সীমা রইল না। তাই আপনারা উড়োজাহাজ ছেড়ে যখন নেমে গেলেন, তখন আমরাও আর থাকতে না পেরে নীচে নেমে পড়লুম। এই ফাঁকে বামনরা যে পালাতে পারে, মনের আনন্দে কারুরই আর সে কথা মনে রইল না।

আপনাদের বোধ হয় স্মরণ আছে, তখনো ভালো ক'রে ভোর হয়নি। মনের খুসিতে নাচতে নাচতে, লাফাতে লাফাতে, চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে আমরা চারিদিকে ছুটাছুটি করতে লাগলুম। বললে আপনারা বিশ্বাস করবেন না, ঠিক সেই সময়ে

ভয়ানক একটা কাণ্ড ঘট্‌ল। আধা-আলোয় আধা-আঁধারে জঙ্গলের ভিতর থেকে হঠাৎ প্রকাণ্ড কি-একটা বেরিয়ে এল,—আমাদের মনে হ'ল যেন একটা পাহাড় লাফাতে লাফাতে ছুটে আস্‌ছে।

প্রথমটা আমরা আতঙ্কে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম, তারপরে পাগলের মতন সকলে মিলে ছুটতে লাগলুম। সেই রাক্ষসটাও যে আমাদের পিছনে পিছনে তেড়ে আস্‌ছে, তার পৃথিবী-কাঁপানো পায়ের শব্দ শুনেই সেটা বেশ বুঝতে পারলুম। মাঝে মাঝে মানুষের কাত্‌রানিও শোনা যেতে লাগ্‌ল—নিশ্চয়ই আমাদের দলের কেউ কেউ তার কবলে গিয়ে পড়েছে।

আরো-বেশী ভয় পেয়ে আমরা আরো-বেশী বেগে দৌড়তে লাগলুম। কিন্তু পিছনের সেই বিষম পায়ের শব্দ আর কিছুতেই যেন থামতে চায় না! এমনি ছুটতে ছুটতে বন-বাঁদাড় ভেঙে আমরা যখন এই হ্রদের ওদিককার তীরে এসে পড়লুম, তখন আমাদের দম প্রায় আঁটকে যাবার মত হয়েছে। আমরা সেইখানেই কেউ ব'সে আর কেউ শুয়ে প'ড়ে জিরুতে লাগলুম। কিন্তু বেশীক্ষণ জিরুতে হ'ল না, হঠাৎ বাজের মতন এক ভীষণ চীৎকার শুনে ফিরে দেখি, সেই পাহাড়ের মত

উঁচু রাক্ষসটা বনের ভিতর থেকে আবার বেরিয়ে আসছে! আমরা সকলে তখনি হ্রদের জলে ঝাঁপ দিলুম। আমাদের ভিতরে তিন-চার জন লোক সাঁতার জানত না, সে বেচারীরা একেবারে তলিয়ে গেল!

সেই সর্ব্বনেশে জীবটা লাফাতে লাফাতে জলের ধার পর্য্যন্ত এল। তারপর এতগুলো শিকার হাতছাড়া হয়ে গেল দেখে, মনের দুঃখে আকাশপানে মুখ তুলে ভয়ানক চ্যাঁচামেচি সুরু ক'রে দিলে!

অনেককক্ষণ সাঁতার কেটে আমরা শেষে এই দ্বীপে এসে উঠলুম।

এখানে এসে প্রথম কয়দিন আমরা বনের ফলমূল খেয়ে কাটিয়ে দিলুম। তারপর হঠাৎ একদিন একরকম আশ্বর্য্য হাঁসের বাসার খোঁজ পেলুম—সে হাঁসদের ডানা নেই। তারপর থেকে ফলমূলের সঙ্গে সেই হাঁসের মাংস আর ডিম পেয়ে এখন আর আমাদের পেটের ভাবনা ভাবতে হয় না।

কি বলচেন? আগুন কোথায় পেলুম? সেও বড় অবাক কারখানা, বাবুজী! ঐ যে পাহাড় দেখছেন, দিন-রাত ওর ভেতরে আগুন জ্বল্‌ছে। আমরা ঐখান থেকেই আগুন আনি।

আবার এই দেখুন, পাথর ঘ'ষে ঘ'ষে আমরা কেমন সব বর্শার ফলা, তীর আর ছুরি-ছোরা-কুড়ুল তৈরি করেচি। অস্ত্রগুলোতে কেমন ধার হয়েচে, দেখচেন তো ? এই-সব ছুরি আর কুড়ুল দিয়ে গাছ কেটে ক'খানা ছিপও বানিয়ে ফেলেচি, এখন দরকার হ'লে জলের উপরেও আনাগোনা করতে পারি! খোদাতালার দয়ায় আমাদের আর অন্য কোন কষ্ট নেই বটে, কিন্তু আজ ক'দিন থেকে নতুন এক বিপদ উপস্থিত হয়েচে !

রোজ রাত্রে কি-একটা অদ্ভুত জন্তু আমাদের সন্ধান পেয়ে বেজায় উৎপাত সুরু করেচে ! এর-মধ্যেই সে আমাদের দল থেকে পাঁচজন লোককে ধ'রে নিয়ে গেছে,—আমরা কিছুতেই তার হাত থেকে ছাড়ান্ পাচ্ছি না। এক রাত্রে চাঁদের আলোয় জন্তুটাকে আমি দেখেচি। দেখতে তাকে বাঘের মত বটে, কিন্তু সে বাঘ নয়। কারণ বাঘের চেয়েও সে ঢের বেশী বড়, আর তার মুখের দুদিকে হাতীর মত দুটো দাঁত আছে !

কি বল্লেন বাবুজী ? সেকেলে খাঁড়া-দেঁতো বাঘ ? সে আবার কি রকম বাঘ ?

তা সে বাঘই হোক্ আর যাইই হোক, আমাদের আর এ দ্বীপে থাকা পোষাবে না। এই বেলা প্রাণ নিয়ে এখান থেকে না পালালে একে একে সবাইকেই মরতে হবে! এখান থেকে কোথায় যাই, বলতে পারেন ?"

আঠারো

জাহাজ ! জাহাজ !

সোনাউল্লার গল্প শেষ হ'লে বিমল বললে, "সোনাউল্লা, তোমাদের বাহাদুরি আছে বটে। এই সৃষ্টিছাড়া মুল্লুকে তোমরা এমন ক'রে সংসার পেতে নিয়েচ!"

সোনাউল্লা দাড়ীতে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, "কিন্তু বাবুজী, এ সংসার আবার আমাদের তুলতে হবে! নইলে ঐ খাঁড়া-দেঁতো বাঘ নিশ্চয়ই আমাদের ফলার ক'রে ফেলবে!"

আমি বল্লুম, "আচ্ছা সোনাউল্লা, তোমরা এক কাজ করনা কেন? আমরা যে গুহায় এতদিন ছিলুম, সে গুহাটা খুব বড় আর নিরাপদ। তার ভেতরে অনায়াসে একশো জনের ঠাঁই হতে পারে। চল, আমরা সকলে মিলে সেইখানে আবার ফিরে যাই!"

সোনাউল্লা বললে, "সে ঠাঁই এখান থেকে কত দূরে বাবুজী ?"

আমি বললুম, "তা ঠিক করে বলতে পারি না। তবে আমরা যে পাহাড়ে থাকি; তার উপরে চড়ে দেখচি এখানে এই একটি বৈ দ্বীপ নেই। তা যদি হয় তাহ'লে আমরা নৌকোয় চড়ে পূর্বদিকের ঐ জঙ্গলের কাছে গিয়ে নামলেই পাহাড়ের খুব কাছে গিয়ে পড়ব।"

সোনাউল্লা বললে, "তাহলে সেই কথাই ভালো। আমরা কাল সকালেই এখান থেকে পালাব। সকলকে খবরটা দিয়ে আসি"—এই ব'লে সে উঠে গেল।

রামহরি মুখ ভার ক'রে বললে, "এদের দলে মোছলমানই বেশী। গুহার ভেতরে এতগুলো মোছলমানের সঙ্গে থাকলে আমাদের যে জাত যাবে বাবু!"

আমি বললুম, "এতই যদি জাতের ভয়, তাহ'লে আজ এদের হাতের রান্না মাংস কি করে খে'লে রামহরি ?"

—"কে বললে আমি মাংস খেয়েচি ? সব আমি লুকিয়ে বাঘাকে দিয়েচি। আমি খালি ফলমূল খেয়ে আছি!"

বিমল হাসতে হাসতে বললে, "তাহ'লে তুমি এক কাজ কর রামহরি! আমরা আমাদের গুহায় ফিরে যাই, আর তুমি একলা এখানে বাস কর। এই দ্বীপে তোমার যে মহাদেব আছেন, তুমি রোজ প্রাণ ভরে তাঁর পূজা করতে পারবে আর তোমার জাতও রক্ষা পাবে!"

—"কি যে হাসো খোকাবাবু, সব ব্যাপারে ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না"—বলতে বলতে রামহরি রাগে গস্ গস্ করতে করতে সেখান থেকে উঠে গেল!"

... ...

পরদিন সকালেই আমরা ছিপে চ'ড়ে বেরিয়ে পড়লুম।

অনেকক্ষণ পরে আমরা যেখানে গিয়ে থামলুম ঠিক তার সাম্‌নেই সেই ভয়াবহ অরণ্য, যার ভিতরে পথ হারিয়ে আমাদের প্রাণ প্রায় যায় যায় হয়ে উঠেছিল।

সেইখানে আমরা ছিপ্ ছেড়ে নেমে পড়লুম। ডাঙায় উঠে বালুকা-প্রান্তরের দিকে তাকিয়েই আমি দেখতে পেলুম, দূরে সমুদ্রের ধারে আমাদের আশ্রয়-স্থান সেই সুপরিচিত পাহাড়টি আকাশ পানে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘণ্টা দুই পরে আমরা আবার আমাদের সেই পুরাতন গুহার মধ্যে ফিরে এলুম।

সেই দিন সন্ধ্যার সময়েই চারিদিক অন্ধকারে ডুবিয়ে ভীষণ এক ঝড় উঠল—তেমন ঝড় আগে কখনো দেখিনি। সাগরের অনন্ত বুক থেকে তরঙ্গের এমন এক অশ্রান্ত কান্না ভেসে এল যে, পৃথিবীর আর সমস্ত শব্দ যেন কোথায় তলিয়ে গেল। ঝড়ের দাপটে আমাদের পাহাড়টা পর্য্যন্ত থর থর ক'রে কাঁপতে লাগ্‌ল।

আমি বললুম, "বিমল, এমনি এক ঝড়ই আমাদের এই দ্বীপের দিকে টেনে নিয়ে এনেছিল, মনে আছে কি!"

বিমল বললে, "মনে আছে বৈকি। সেদিনের কথা কি এ জীবনে আর ভুলতে পারব?"

কুমার বললে, "আজকের এই ঝড়টা, যদি দ্বীপটাকে আমাদের দেশের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারত!"

এম্‌নি গল্প করতে করতে আর ঝড়ের হাহাকার শুনতে শুনতে আমরা একে একে ঘুমিয়ে পড়লুম।......

হঠাৎ অনেকের চীৎকারে আর টানাটানিতে আমার

ঘুম ভেঙে গেল—শুনলুম কমল চীৎকার ক'রে বলছে, "বিনয়বাবু—জাহাজ, জাহাজ!"

তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে দেখি, গুহার ভিতরে ভোরের আলো এসে পড়েছে আর আমার পাশে বিমল, কুমার, কমল ও রামহরি অত্যন্ত উত্তেজিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "ব্যাপার কি, তোমরা এত গোলমাল করচ কেন?"

বিমল বললে, "শীগ্‌গির উঠে আসুন বিনয়বাবু, দ্বীপের কাছে একখানা জাহাজ এসে নঙর ফেলেচে।"

শুনেই এক লাফে উঠে দাঁড়ালুম, তারপর ছুটে গুহার বাইরে গিয়ে পুলকিত নেত্রে দেখলুম, আকাশে বাতাসে কোথাও আর ঝড়ের চিহ্ন নেই এবং নীল-সমুদ্রের উপরে একখানি লাল রঙের প্রকাণ্ড জাহাজ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

চোখের সাম্‌নে, সেই জাহাজের গায়ের উপরে ফুটে উঠল—গঙ্গা-ধোয়া, আম-কাঁঠালের বন-দিয়ে-ঘেরা, কোকিল-পাপিয়া-ডাকা আমাদের বাংলা-দেশের আসল ছবি।

উনিশ

ট্রাইশেরাটপ্‌স্‌

আনন্দের প্রথম আবেগটা কেটে গেলে পর সবাইকে ডেকে বললুম—"ভাই সব! আজ এতদিন পরে ভগবান আমাদের ওপরে মুখ তুলে চেয়েচেন! এতদিন পরে আবার আমাদের দেশে ফেরবার সুযোগ ঘটেচে, এমন সুযোগ গেলে আর পাব না! তোমরা সবাই মিলে চীৎকার কর, আমি আর বিমল সেই সঙ্গে বন্দুকের আওয়াজ করি। তাহ'লেই জাহাজের লোকেরা শুনতে পাবে।"

আমাদের দল এখন খুব ভারি। কাজেই সকলে মিলে যখন চীৎকার করতে লাগল, সারা আকাশটা যেন কেঁপে উঠল। তার উপরে আমার আর বিমলের বন্দুকের আওয়াজ!

হঠাৎ জাহাজ থেকেও বার-কয়েক বন্দুকের শব্দ হ'ল!

কমল আনন্দে লাফাতে-লাফাতে বললে, "শুনতে পেয়েচে। শুনতে পেয়েচে! জাহাজের লোকেরা আমাদের চীৎকার শুনতে পেয়েচে!"

কুমার বললে, "ঐ যে, জাহাজ থেকে দুখানা নৌকো নীচে নামিয়ে দিচ্ছে। ঐ যে, জনকয়েক লোকও দড়ীর সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামচে।"

রামহরি বললে, "দেখে মনে হচ্চে ওরা যেন জাহাজী গোরা।"

দুখানা নৌকো তীরের দিকে আসতে লাগল।

রামহরির কথাই সত্য। নৌকোর উপরে যারা রয়েছে, তারা সকলেই নীল পোষাক-পরা বিলাতী খালাসী।

নৌকো তীরের কাছে আসবামাত্র আমরা তাড়াতাড়ি তার কাছে ছুটে গেলুম। আজ কতদিন পরে পৃথিবীর নূতন লোকের সঙ্গে দেখা। সাহেব হ'লেও তাদের যেন ভাই ব'লে মনে হ'তে লাগল।

একজন সাহেব আমার কাছে এগিয়ে এলেন। তাঁর পোষাক দেখেই বুঝলুম, নিশ্চয়ই তিনি জাহাজের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী।

তিনি ইংরেজীতে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,

"তোমদের দেখে তো ভারতবর্ষের লোক ব'লে মনে হচ্চে! কিন্তু আটলান্টিক মহাসাগরের এই অজানা দ্বীপে তোমরা এলে কেমন ক'রে? আমাদের জাহাজ ঝড়ের তোড়েই এদিকে এসে পড়েচে, নইলে এ দ্বীপে তো কখনো কোন জাহাজ থামে না।"

আমি বললুম, "সায়েব, আমরা মঙ্গলগ্রহে ছিলুম, সেখানকার উড়োজাহাজে চ'ড়ে এখানে এসেচি।"

—"কি বললে? তোমরা মঙ্গলগ্রহে ছিলে?"

—"হ্যাঁ, সায়েব।"

—"তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করচ?"

—"না সায়েব! বিশ্বাস না হয়, আমার সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করুন।"

—"তা হ'লে তোমরা সবাই পাগল!"

—"হ্যাঁ সায়েব, প্রথমে আমাদের কথা পাগলের প্রলাপ বলেই মনে হবে বটে! কিন্তু পরে আমাদের সব কথা শুনলেই বুঝবে আমরা সত্যি বলচি কি না! আপাততঃ আমরা আর কিছু চাই না, এ ভয়ানক দ্বীপ থেকে আগে আমাদের উদ্ধার কর!"

—"এ দ্বীপকে ভয়ানক বলচ কেন?"

—"সায়েব, এখানে যে-সব ভীষণ জীবজন্তু আছে, তুমি স্বপ্নেও কখনো তাদের দেখনি!"

—"সে আবার কি?"

—"এ দ্বীপের বাসিন্দা কারা জানো? পাহাড়ের মতন উঁচু ডিপ্লোডোকাস আর ডাইনোসর, হাতীর মতন বড় বড় ষাঁড়, উড়ন্ত সরীসৃপ বা টেরোডাক্‌টাইল, খাঁড়াদেঁতো বাঘ, দানব শ্লথ—"

আমার কথা শেষ হবার আগেই সাহেব হো হো ক'রে হেসে উঠে বললেন, "থামো, থামো, আর পাগলামি কোরো না!"

—সেই সঙ্গেই গোরা খালাসীরা চারিদিক কাঁপিয়ে বিকট চীৎকার ক'রে উঠল!

ফিরে দেখি আমাদের কাছ থেকে খানিক তফাতেই একটা ছোটখাট বনের ভিতর থেকে সাহেবের ব্যঙ্গ-হাসির মূর্ত্তিমান প্রতিবাদের মত কিম্ভূতকিমাকার প্রকাণ্ড এক জানোয়ার বেগে বেরিয়ে আসছে। কেবলমাত্র তার মুখটাই বোধ হয় সাতফুটেরও চেয়ে বেশী লম্বা এবং তার মাথার উপরে ত্রিশূলের মতন তিনটে ধারালো শিং ও তার মুখখানা দেখতে যেন অনেকটা আমাদের জগদ্ধাত্রী দেবীর কাল্পনিক সিংহের

মত। তার চেহারা দেখে বুঝলুম সে হচ্ছে ট্রাই-শেরাটপ্‌স।

সাহেব আর গোরা-খালাসীরা চোখের পলক না ফেল্‌তে এক ছুটে নৌকোর উপরে গিয়া উঠল এবং বলা বাহুল্য আমরাও সকলে গিয়ে নৌকার উপরে আশ্রয় নিতে কিছুমাত্র বিলম্ব করলুম না। নৌকো ছুখানা জাহাজের দিকে চলল, সাহেব আমার করমর্দ্দন ক'রে বললেন, "তোমার কথায় অবিশ্বাস করেছিলুম ব'লে এখন আমি ক্ষমা চাইচি! আজ যা দেখলুম, জীবনে আর ভুলব না!"

জাহাজ ছাড়ল,—মানুষের দেশে আবার আমাদের পৌঁছে দেবে ব'লে! আবার যে স্বদেশে ফিরতে পারব, এই আনন্দে আমাদের সমস্ত মন যেন আকুল হয়ে উঠল!

কিন্তু ঠিক শেষ-মুহূর্ত্তেই এই দানব-রাজ্যের কয়েকটি সুপরিচিত দূত আকাশ-পথে আর একবার আমাদের দেখা দিলে। তারা সেই গরুড়পাখী বা টেরোডাক্‌-টাইল। বিশ ফুট জুড়ে ডানা ছড়িয়ে তারা উড়ে যাচ্ছে দলে দলে!

যে ছুটো পাখী আমাদের খুব কাছে ছিল, হঠাৎ

তাদের মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল ! কি বিষম তাদের ঝটাপটি, কি কর্কশ তাদের চীৎকার !

জাহাজশুদ্ধ লোক ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে সেই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখতে লাগল। অনেক গোরা-খালাসী হাঁটু গেড়ে ব'সে উপাসনায় প্রবৃত্ত হ'ল, একজন পাদ্রী তাঁর ক্রুশখানা উঁচু ক'রে তুলে ধরলেন—সকলের মুখ দেখে মনে হ'ল, নিশ্চয়ই তারা তাদের উড়ন্ত প্রেতাত্মা বা নরকের দূত ব'লে ধ'রে নিয়েছে ! স্ত্রীলোকেরা আর শিশুরা তো কেঁদেই অস্থির—কেউ কেউ মূর্চ্ছিতও হয়ে পড়ল !

এমনি ভয়, বিস্ময়, আর্ত্তনাদের মধ্যে জাহাজ বেগে অগ্রসর হ'ল, গরুড়-পাখীরাও ধীরে ধীরে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। পাদ্রী-সাহেব বললেন, তাঁর পবিত্র ক্রুশ দেখেই সয়তানের দূতেরা ভয় পেয়ে আবার নরকে পালিয়ে গেল !

ময়নামতীর মায়াকানন ক্রমেই আকাশের নীলপটে মিলিয়ে যাচ্ছে, পাহাড়গুলোকে দূর থেকে দেখাচ্ছে চিত্রে-লেখা মেঘের মত।

রামহরি বললে, "বাবু, দেশে ফিরে এবার আর আমি তোমাদের দলে ভিড়ব না !"

বিমল হেসে বললে, "কেন ?"

—"তোমরা সব করতে পারো বাবু! আবার কোন্‌দিন হয়তো স্বশরীরে স্বর্গে যাবার বায়না ধরবে! তোমাদের পায়ে দূর থেকেই নমস্কার।"

বাঘার মাথা চাপড়ে কুমার বললে, "হ্যাঁরে বাঘা, তোর কি মত ?"

বাঘা ল্যাজ নেড়ে জবাব দিলে, "ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ !"

ভোরের পূরবী (ফরাসী উপন্যাসের অনুবাদ) ১।০

সুচরিতা (রুস উপন্যাসের অনুবাদ) ১।০

প্রেমের প্রেমারা (মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হাস্যনাট্য) ।৵০

পথের মেয়ে (যন্ত্রস্থ উপন্যাস)

গানের মালা (যন্ত্রস্থ সঙ্গীত-সংগ্রহ)

প্রাপ্তিস্থান ঃ—ডি, এম, লাইব্রেরী

৬১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের গ্রন্থাবলী

আলেয়ার আলো (উপন্যাস)		১।৵
জলের আল্পনা	ঐ	১॥০
কালবৈশাখী	ঐ	১॥০
পায়ের ধূলো	ঐ	২৲
ঝড়ের যাত্রী	ঐ	২৲
বেনোজল	ঐ	২৲
পদ্মকাঁটা	ঐ	১।০
ফুলশয্যা	ঐ	১।০
রসকলি	ঐ	২৲
যকের ধন	ঐ	১৲
ছায়াকানন	ঐ	১।০
মেঘদূতের মর্ত্তে আগমন (ঐ, যন্ত্রস্থ)		
মণিকাঞ্চন	(উপন্যাস)	২৲
পসরা	(গল্পের বই)	১।০
সিঁদুরচুপড়ী	ঐ	॥০
মধুপর্ক	ঐ	॥০
মালাচন্দন	ঐ	১।০
যৌবনের গান (কবিতার বই)		১।০
ওমর খৈয়ামের রুবায়ত (অসংখ্য চিত্র-সংবলিত)		৪৲
ছুটির ঘণ্টা (বালক-পাঠ্য সচিত্র গল্পের বই)		১৲